মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ আমল তাকে পীড়া দেয় সেই পূর্ণ মুমিন’ *(তিরমিযী হা/২১৬৫, সনদ ছহীহ)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০২২

তাবলীগী ইজতেমা
২০২২ সংখ্যা

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ٦، رجب وشعبان ١٤٤٣هـ/ مارس ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : আল-জাব্বার মসজিদ, বানদুং, পশ্চিম জাভা, ইন্দোনেশিয়া।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

হাওয়া গ্রুপ
Hawa Group

মাটি থেকে উৎপাদিত দেশীয় ঐতিহ্যে ভরপুর,"হাওয়া" মুগ, খেসারী, মটর, বুট, কালাই (ডাল), যা প্রাকৃতিকভাবে সংগৃহীত ও সেরা জাতের বিশুদ্ধ দানা থেকে সম্পূর্ণ খাঁটিভাবে বাছাইকৃত, আধুনিক প্রযুক্তিতে সয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুতকৃত এবং প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ ও স্বাদের নিশ্চয়তার ও বিশ্বস্ততার প্রতীক, হাওয়ার সকল পণ্য এখন বাজারে।

আলহামদুলিল্লাহ আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, হাওয়া গ্রুপের সকল পণ্য এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে

গুণে মানে শতভাগ খাঁটি, পুষ্টিতে ও দেশীয় স্বাদের-সুমিষ্ট সমাহার
হাওয়ার উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে এলো আপনার
চাহিদার এক নিবিড় মেলবন্ধন

রাজধানী ঢাকা সহ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা শহরে ডিলার নিয়োগ চলছে-
আগ্রহীদেরকে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে-

শীঘ্রই বাজারে আসছে

- হাওয়া আটা
- হাওয়া ময়দা
- হাওয়া সুজি
- হাওয়া হলুদের গুড়া
- হাওয়া মরিচের গুড়া
- হাওয়া জিরা গুড়া
- হাওয়া ধনিয়া গুড়া
- হাওয়া গরম মসলা
- হাওয়া চিনিগুড়া চাল
- হাওয়া চা পাতা
- হাওয়া আমের আচার
- হাওয়া ম্যাংগো বার
- হাওয়া প্রিমিয়াম মধু
- হাওয়া ডাল ভাজা
- হাওয়া মটর ভাজা
- হাওয়া সরিষার তেল
- হাওয়া প্রিমিয়াম লবণ
- হাওয়া ড্রিংকিং ওয়াটার
- হাওয়া মুড়ি
- হাওয়া তেতুল চাটনী

হাওয়া গ্রুপ হেড অফিস : বানেশ্বর বাজার, পুঠিয়া, রাজশাহী। কর্পোরেট অফিস : হাউজ-২, রোড-৫, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২। মোবাইল : ০১৩০১-৪৯৭৬১১, ০১৭৪৭-৭৫৩৪৭৭
ই-মেইল : hawaflourmill44@gmail.com, ওয়েব : www.hawagroupbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
রজব-শা'বান	১৪৪৩ হি.
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪২৮ বাং
মার্চ	২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **দরসে কুরআন :**
▶ অল্পতেই জান্নাত *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৩
◆ **প্রবন্ধ :**
▶ দ্বীন প্রচারে ওয়ায মাহফিল : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ০৮
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
▶ দাওয়াত ও সংগঠন *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ১৩
▶ দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমাজে তার প্রভাব ১৭
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
▶ হতাশার দোলাচলে ঘেরা জীবন : মুক্তির পথ ২৪
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
▶ কুরআনের বঙ্গানুবাদ, মুদ্রণ প্রযুক্তি ও উনিশ শতকের মুসলিম সমাজে এর প্রভাব *-অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২৭
◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
▶ মিয়ানমার ও ভারতের নাগরিকত্ব আইন বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকি *-জামালউদ্দীন বারী* ৩৬
◆ **মনীষী চরিত :**
▶ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ৩৯
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪৪
◆ **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
▶ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যুকালীন নছীহত ৪৫
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
◆ **ক্ষেত-খামার :**
▶ বছরে পাঁচ কোটি টাকার চারকোল রফতানী করেন নাজমুল ইসলাম ৪৬
◆ **চিকিৎসা জগৎ :**
▶ ওষুধের অপব্যবহার : সমস্যা ও সতর্কতা ৪৭
◆ **কবিতা :** ৪৯
▶ রামাযানের হাতছানি ▶ তাবলীগী ইজতেমা
▶ বিশ্ব মুসলিম খাচ্ছে মার
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৫০
◆ **মুসলিম জাহান** ৫২
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৫২
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৫৭

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

পর্দা নারীর অঙ্গভূষণ

সম্প্রতি ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের উদুপী যেলার সরকারী কলেজে কয়েক সপ্তাহ যাবত ৬ জন মুসলিম ছাত্রীর হিজাব পরতে বাধা দেওয়া হয় এবং একে তাদের কলেজের ইউনিফর্ম বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কলিকাতা সহ ভারতের প্রায় সকল বড় বড় শহরে। ইতিমধ্যে এটি আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। ২০১৪ সালে নোবেল জয়ী পাকিস্তানী তরুণী মালালা ইউসুফ জাই ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে বলেছেন, মুসলিম নারীদের কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা বন্ধ করুন!' অন্য ঘটনায় ৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মাণ্ডিয়া যেলার মাণ্ডিয়া প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজে 'মুসকান' নামের একজন মুসলিম ছাত্রীর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, সে নেক্বাব সহ সর্বাঙ্গ আবৃত ঢিলা-ঢালা কালো বোরকা পরে কলেজ ক্যাম্পাসে স্কুটি থেকে নেমে তার ক্লাসের দিকে যাচ্ছে। পিছনে একদল গেরুয়া বসনধারী যুবক 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিতে দিতে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন মেয়েটি বাম হাত উঁচিয়ে তাদের দিকে চিৎকার দিয়ে বারবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিচ্ছে। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ এসে তাকে ভিতরে নিয়ে যায়। দৃশ্যটি সারা দুনিয়াকে নাড়িয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে 'মুসকান' এখন সাহসের প্রতীক। পাকিস্তানের মালালার মতো সেও এ বছর নোবেলজয়ী হবে বলে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে ভারতের 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' তার জন্য ৫ লাখ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমরাও তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তার জন্য প্রাণখোলা দো'আ করছি।

ইতিপূর্বে ২০১৯ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ভারতের পণ্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণযোগাযোগ' বিষয়ে মাস্টার্সে সর্বোচ্চ নম্বরধারী রাবেয়া আব্দুর রহীমকে স্রেফ হিজাবের কারণে পুলিশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢুকতে দেয়নি। যেখানে প্রধান অতিথি দেশের রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে তার 'স্বর্ণপদক' নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাধা পেয়ে সে স্বর্ণপদক ছেড়ে বাসায় ফিরে আসে। তাতে দেশব্যাপী তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এভাবে ভারতে এখন রাষ্ট্রীয় মদদে পদে পদে নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন সে দেশের মুসলিম নাগরিকরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও চলছে নানা বর্ণ বৈষম্য। অথচ ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২৫ অনুচ্ছেদে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের মৌলিক ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আর এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করার চেতনায় ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে। সেখানে হিন্দুরা তিলক পরে, শিখরা দাড়ি ও পাগড়ি পরে, মুসলমানরা টুপী ও বোরকা পরে। এগুলি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বর্তমানে যেটি হচ্ছে, সেটি রাজনীতিক নামধারী উগ্র ভোট ব্যবসায়ীদের কারসাজি মাত্র।

ভারতের বর্তমান হিন্দুত্ববাদী মোদী সরকারের বিপরীতে যদি আমরা নিউজিল্যাণ্ডের মহিলা প্রধানমন্ত্রী জেসিণ্ডার তুলনা করি, তাহ'লে দেখব যে সেখানের ক্রাইস্টচার্চে ২০১৯ সালের ১৫ই মার্চ মুসলমানদের দু'টি মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা হ'লে তিনি দ্রুত মুসলমানদের পক্ষে বিবৃতি দেন। পার্লামেন্টের যরূরী অধিবেশন আহ্বান করেন। নিজে সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢেকে পার্লামেন্টে আসেন। জুব্বা ও টুপী পরিহিত একজন মুসলিম আলেমকে পাশে বসিয়ে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু করেন। ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি আসসালামু 'আলায়কুম বলে বক্তব্য শুরু করেন। অতঃপর হামলার দিনটিকে তিনি মুসলিম কমিউনিটির জন্য 'অন্ধকারতম দিবস' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি সন্ত্রাসীদের দ্রুত বিচারের আশ্বাস দেন এবং নিহত ৫২ জনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি দেশের সকল রেডিও ও টেলিভিশনকে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ও আযান প্রচারের নির্দেশ দেন। সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের এরূপ সহমর্মিতার নযীর এ যুগে বিরল। অথচ ভারতে ২৫ কোটি মুসলমানের বিপরীতে নিউজিল্যাণ্ডে ২০১৬ সালের হিসাবে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ৪৬ হাযার। যা সেদেশের মোট জনসংখ্যার ১.১ শতাংশ। আর ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪.২ শতাংশ ২০১৯ সালের হিসাবে।

হিজাব নারীর অঙ্গভূষণ। এটি তার রক্ষাকবচ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি প্রত্যেক নারীর স্বভাবগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যথাযোগ্য পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছে *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। বিশেষভাবে নারীকে ঢিলা-ঢালা বড় চাদর পরিধানের মাধ্যমে সর্বাঙ্গ ঢাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। কে না জানে যেটি যত মূল্যবান, সেটিকে তত বেশী গোপন রাখতে হয়। মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য কি যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়? খোসা ছাড়ানো কলা কি কেউ কিনে খেতে চায়? হরিণ ও ছাগল দু'টিই পশু। কিন্তু হরিণ কেন বনের মধ্যে গোপন থাকে? কারণ তার নাভিতে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান 'কস্তুরী'। যাকে 'মৃগনাভি' বলা হয়। নারীর গর্ভ থেকেই বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি নবী-রাসূল, সমাজনেতা-রাষ্ট্রনেতা ও যুগ সংস্কারকগণ। যারা বিশ্বের মৃগনাভি তুল্য। মাঠের ঘাস হয় শক্ত ও খসখসে। কিন্তু সেটি চাপা দিয়ে রাখলে সেগুলি হয় নরম ও মোলায়েম। যার অনুভূতি মানুষকে শিহরিত করে। পূণ্যশীলা নারী তেমনি নিরাশ হৃদয়ে আশার শিহরণ জাগিয়ে তোলে। চাকায় টায়ার-টিউব দু'টিই থাকে, কিন্তু টায়ার থাকে বাইরে এবং টিউব থাকে ভিতরে। যদি কেউ টিউবকে বাইরে ও টায়ারকে ভিতরে দিতে চায়, তাহ'লে গাড়ী অচল হয়ে যাবে। একইভাবে নারী ও পুরুষকে যথাযোগ্য স্থানে না রাখলে সমাজ ধ্বংস হবে। মানব সমাজের সবচাইতে মূল্যবান অংশ হ'ল নারী জাতি। পুরুষরা তাদের অভিভাবক *(নিসা ৪/৩৪)*। স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতা তার প্রধান চার রক্ষাব্যূহ। এছাড়াও নারীর সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরুষ সমাজের। তাদেরকে সে দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ ও নারীর শারীরিক ও মানসিক কাঠামো পৃথক। এই পার্থক্যকে অস্বীকার করা চৈত্রের খরতাপ ও বসন্তের পেলব-পরশকে অস্বীকার করার শামিল। নারীকে আল্লাহ আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তাই শালীন পোশাক তার জন্য অপরিহার্য। বাড়ির মালিক কোথাও বের হ'লে যেমন দরজা-জানালা বন্ধ করে বের হন, তেমনিভাবে নারী ঘরের বাইরে গেলে তার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে নেক্বাব ও ঢিলা বোরকার আড়ালে লুকিয়ে বাইরে যাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নারী হ'ল পর্দার জাতি। যখনই সে বের হয়, তখনই শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। আল্লাহ বলেন, নারীরা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য্য প্রকট হয়ে পড়ে' *(নূর ২৪/৩১)*। হাদীছে পরপুরুষ ও পরনারীর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, পরস্পরের কণ্ঠস্বর, হাতের স্পর্শ, কুচিন্তা, অবৈধ উদ্দেশ্যে গমন সবকিছুকে 'যেনা' বলা হয়েছে। যার বাস্তবায়ন হয় ব্যভিচারের মাধ্যমে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৬)*। অতএব সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে যেকোন মূল্যে নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা এবং সমাজদেহকে কলুষমুক্ত রাখা। ভারত ও বাংলাদেশের সরকারগুলিকে আমরা এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

অল্পতেই জান্নাত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً– ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে (আমরা তাদের পুরস্কৃত করি)। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তার পুরস্কার বিনষ্ট করি না’ *(কাহফ-মাক্কী ১৮/৩০)*।

প্রত্যেক মুমিন জান্নাত চায়। অধিকাংশ মুমিন এটিকে খুব কঠিন বলে মনে করেন। অথচ অল্প মেহনতেই জান্নাত পাওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকাংখা ব্যতীত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আখেরাতে জওয়াবদিহিতার অনুভূতি এবং জান্নাত লাভের আকুতি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণেই মানুষ সৎকর্মের বদলে অসৎকর্মের দিকে ধাবিত হচ্ছে বেশী। ইসলাম মানুষকে সর্বদা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের আহ্বান জানায়। মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ ‘শ্রেষ্ঠ জাতি’ হিসাবে অভিহিত করার মূল কারণ এটাই *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১১০)*।

দরসে বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মুমিনের ছোট-বড় সকল সৎকর্মের পুরস্কার দিয়ে থাকেন এবং কোন সৎকর্মের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না। ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে তিনি বলেন, لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ : حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ– ‘মদীনায় তোমরা এমন একদল সাথীকে ছেড়ে এসেছিল, যারা তোমাদের সাথে তাবূকের সফরে, জিহাদে সম্পদ ব্যয়ে এবং (মদীনা থেকে তাবূক যাতায়াতের) দীর্ঘ সফরে তোমাদের সাথী ছিল। সাথীরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা মদীনায় থেকে কিভাবে আমাদের সাথে থাকল? জবাবে তিনি বললেন, সঙ্গত ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল’।[১] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ– وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসী বেদুঈনদের উচিত ছিল না আল্লাহ্র রাসূল থেকে পিছিয়ে থাকা এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করা। কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে এবং তাদের যেসব পদক্ষেপ কাফেরদের ক্রোধান্বিত করে ও শত্রুদের পক্ষ হ’তে যেসব কষ্ট তারা প্রাপ্ত হয়, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সেটি সৎকর্ম হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না’ *(১২০)*। ‘আর (আল্লাহ্র পথে) ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাই-ই তারা ব্যয় করে এবং যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, সবকিছু তাদের জন্য লিপিবদ্ধ হয়, যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহের উত্তম বিনিময় দান করতে পারেন’ *(তওবা-মাদানী ৯/১২০-২১)*।

পরস্পরে হিংসা-হানাহানি, যিদ-হঠকারিতা ও মনুষ্যত্বহীনতার জাহেলিয়াতে ডুবে থাকা আরব জাতিকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। যা তাদের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সেই সমাজে আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, হামযা, আব্বাস, ত্বালহা, যুবায়ের প্রমুখ বিশ্বসেরা মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের ও তাদের পরবর্তীদের নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহ বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে মরু বেদুঈনদের আক্বীদায় বিপ্লব এনেছিলেন, সে বিষয়ে কিছু হাদীছ ও ঘটনা আমরা নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।-

কিছু ঘটনা : (১) ওবায়দাহ আল-হুজায়মী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলেন, আমি বেদুঈনদের লোক। আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে উপকৃত করেন। তিনি বললেন, اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي،... ‘আল্লাহকে ভয় করো। আর তোমরা অতি সামান্য সৎকর্মকেও তুচ্ছ মনে করো না। যদিও সেটি তোমার পানপাত্রের নীচের অবশিষ্ট পানি অপরকে পান করিয়েও হয়’।[২] মরু বেদুঈনরা ছিল অস্বচ্ছল ও অভাবী। তাই তাদেরকে তিনি এমন উপদেশ দিলেন, যেজন্য কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না।

(২) কৃষ্ণকায় হাবশী ক্রীতদাস বেলালকে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنِّي سَمِعت دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ الْجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لم أَتَطَهَّرَ طُهُورًا مِّنْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ

১. *আবুদাঊদ হা/২৫০৮; বুখারী হা/২৮৩৯ রাবী আনাস (রাঃ)।*

২. *আহমাদ হা/২০৬৫২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫২২; ছহীহাহ হা/৭৭০।*

www.at-tahreek.com

أُصَلِّيَ– ‘হে বেলাল, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর এমন কি আমল কর যে, আমি তোমাকে জান্নাতে আমার আগে আগে জুতার আওয়ায শুনতে পেলাম? বেলাল বললেন, আমি যখনই ওযূ করি, তখনই তাহিইয়াতুল ওযূ দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করি যতটুকু আল্লাহ আমাকে সামর্থ্য দেন’।[৩]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ– ‘জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় কাঁটাওয়ালা একটি ডাল দেখতে পেয়ে সেটিকে সরিয়ে দিল। এতে আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন’।[৪]

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ– ‘একদিন বনু ইস্রাঈলের এক বেশ্যা নারী দেখল যে একটি কুকুর পিপাসায় হাসফাঁস করছে ও তার মৃত্যুর উপক্রম হয়েছে। তখন সে তার ওড়নার মাথায় চামড়ার মোযা বেঁধে কূয়ায় ফেলে পানি ভরে উঠিয়ে আনল এবং কুকুরকে পান করালো। তাতে কুকুরটি বেঁচে গেল। এতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন’। বলা হ’ল আমাদের চতুস্পদ পশু সমূহ আছে। তাদের সেবা করায় কি আমরা কোন নেকী পাব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ– ‘প্রত্যেক তাজা কলিজার বিনিময়ে নেকী রয়েছে’।[৫] পক্ষান্তরে জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে না দেওয়ায় বা ছেড়ে না দেওয়ায় মারা গেলে সে জাহান্নামে শাস্তি প্রাপ্ত হয়’।[৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, তুচ্ছ কারণে মানুষ জাহান্নামে যায়।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের পূর্বেকার জনৈক ব্যক্তির রূহ কবয করতে গিয়ে ফেরেশতারা তাকে বলল, أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ لاَ، قَالُوا : تَذَكَّرْ، قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنْهُ– ‘তুমি কি কোন সৎকর্ম করেছ? সে বলল, না। তারা বলল, মনে করে দেখ। তখন সে বলল, আমি মানুষকে ঋণ দিতাম এবং আমার ছেলেদের বলতাম, যেন তারা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ ব্যক্তিদের অবকাশ দেয় এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে’। এতে আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন’।[৭]

(৬) কৃষ্ণকায় নিগ্রো হাবশী মহিলা উম্মে মেহজান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ ঝাড়ু দিত ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখত। এক রাতে মহিলাটি মারা গেল। তখন লোকেরা রাতেই দ্রুত তার কাফন-দাফন সম্পন্ন করল। কয়েকদিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ মহিলাটি কোথায়? লোকেরা বলল, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, কেন তোমরা আমাকে জানাওনি? লোকেরা বিষয়টিকে ছোট মনে করেছিল। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও! অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন। তার জানাযা করলেন ও তার জন্য দো‘আ করলেন। অতঃপর বললেন, إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ– ‘এখানকার কবরগুলি অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। আমার ছালাতের কারণে আল্লাহ সেগুলিকে আলোকিত করে দিয়েছেন’।[৮]

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল!

إِنَّ فُلاَنَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةً تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تؤذي جِيرَانَهَا، قَالَ : هِيَ فِي الْجَنَّةِ– ‘অমুক মহিলা ছালাত ও ছিয়াম আদায়ে এবং ছাদাক্বা দানের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে তার যবান দিয়ে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ মহিলা জাহান্নামী। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক মহিলা ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা দানে কম প্রসিদ্ধ। সে শুধু কয়েক টুকরা পনির আল্লাহর রাস্তায় দান করে। কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে জান্নাতী’।[৯] অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, অল্পতেই জাহান্নাম ও অল্পতেই জান্নাত।

(৮) একদিন জনৈক আনছার ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলে তিনি বললেন, লোকটি জান্নাতী। ব্যক্তিটি পরপর তিন দিন এল এবং রাসূল (ছাঃ) তিন দিন তার সম্পর্কে একই কথা বললেন। তখন তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর তার পিছু নিলেন। অতঃপর তার বাড়ীতে পৌঁছে বললেন, আমি তিনদিন আপনার বাড়ীতে মেহমান থাকব। তিনি থাকলেন এবং ঐ ব্যক্তির সকল কাজ-কর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। বিদায়ের দিন তিনি বললেন, হে ভাই! আমি আপনার মধ্যে বিশেষ কোন সৎকর্ম দেখলাম না, যেজন্য রাসূল (ছাঃ) আপনাকে তিনদিনই ‘জান্নাতী’ বললেন। লোকটি বলল, مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّى لاَ أَجِدُ فِى نَفْسِى لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ

---

৩. *বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।*
৪. *বুখারী হা/৬৫২; মুসলিম হা/১৯১৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*
৫. *বুখারী হা/৩৩২১; মুসলিম হা/২২৪৪; মিশকাত হা/১৯০২।*
৬. *বুখারী হা/২৩৬৫; মুসলিম হা/২২৪২; মিশকাত হা/১৯০৩।*
৭. *বুখারী হা/২০৭৭; মুসলিম হা/১৫৬১; মিশকাত হা/২৭৯১ রাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)।*
৮. *বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬; মিশকাত হা/১৬৫৯ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*
৯. *আহমাদ হা/৯৬৭৩; মিশকাত হা/৪৯৯২; ছহীহাহ হা/১৯০।*

اللهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذِهِ الَّتِى بَلَغَتْ بِكَ وَهِىَ الَّتِى لاَ نُطِيقُ– ‘আমি অন্যদের মতোই সাধারণ সৎকর্ম করে থাকি। তবে আমি কারুর উপর আল্লাহ্র বিশেষ কোন নে‘মত দেখলে সেজন্য তার প্রতি কোন হিংসা পোষণ করিনা’। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, সম্ভবতঃ একারণেই আপনি এই সুসংবাদ পেয়েছেন। যা আমরা পারিনা’ *(আহমাদ হা/১২৭২০, সনদ ছহীহ)*।

(৯) আবু যার গিফারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ– ‘সামান্য নেকীর কাজকেও তুমি ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হ’লেও’।[১০]

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ– ‘হে মুমিন নারীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে বকরীর পায়ের দুই ক্ষুরের মধ্যেকার সামান্য গোশত দিয়ে সাহায্য করাকেও তুচ্ছ মনে করো না’।[১১] উম্মে বুজাইদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ– ‘পোড়ানো ক্ষুর হ’লেও সায়েলকে দাও’।[১২]

(১১) আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ– ‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা খেজুরের টুকরা দিয়েও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে, তবে সে যেন তা করে’।[১৩]

(১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا– ‘হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ’তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে কৈফিয়ত তলব করা হবে’।[১৪]

(১৩) হযরত জাবের ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ– ‘প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা’।[১৫]

(১৪) হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, صَعِدَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ فَقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ–

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম ধাপে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় ধাপে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় ধাপে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে তিন ধাপে তিন বার ‘আমীন’ বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম ধাপে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ’ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন’! ২য় ধাপে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর ৩য় ধাপে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বলা হ’ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর সে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। আমি বললাম, আমীন’![১৬] দেখার বিষয় যে, প্রথম দুই ধাপে ‘আমীন’ বললেও ৩য় ধাপে রাসূল (ছাঃ) ‘আমীন’ বলেননি। জিব্রীল বলতে বললে তিনি ‘আমীন’ বলেন। কারণ এটি ছিল তাঁর নিজের উপর দরূদ পড়ার বিষয়।

(১৫) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ– ‘তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম মনে হয়। কিন্তু নবী (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসকর মনে করতাম’।[১৭]

(১৬) হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْكُمْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ

---

১০. *মুসলিম হা/২৬২৬, তিরমিযী হা/১৮৩৩, মিশকাত হা/১৮৯৪ ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘ছাদাক্বার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।*
১১. *বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম হা/১০৩০; মিশকাত হা/১৮৯২।*
১২. *আহমাদ হা/১৬৬৯৯; নাসাঈ হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/১৯৪২।*
১৩. *মুসলিম হা/১০১৬ ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।*
১৪. *নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩, মিশকাত হা/৫৩৫৬ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৭৩১।*
১৫. *বুখারী হা/৬০২১, মুসলিম হা/১০০৫, মিশকাত হা/১৮৯৩ ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘ছাদাক্বার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৬।*
১৬. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী।*
১৭. *বুখারী হা/৬৪৯২; মিশকাত হা/৫৩৫৫ ‘তাওয়াক্কুল ও ছবর’ অনুচ্ছেদ।*

وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ– ‘তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্বর বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না এবং কোন পর্দা থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর তাকাবে বাম দিকে, তখনো তার কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তখন সে সামনে তাকাবে, কিন্তু সেখানে সে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো একটা খেজুরের টুকরা দিয়ে হ’লেও’। বর্ধিত বর্ণনায় এসেছে, ‘নির্দোষ কথা দ্বারা হ’লেও’।[১৮]

(১৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطفِئُ عن أَهْلِها حَرَّ القُبورِ، وإِنّما يَستَظِلُّ المؤمنُ يومَ القيامةِ في ظِلِّ صَدَقَتِه– ‘নিশ্চয় ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে’ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*। অতএব মৃত্যুর পূর্বেই যাকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে যথাসম্ভব ব্যয় করুন ও নিজের কবরের উত্তাপ নিভানোর চেষ্টা করুন!

(১৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন জনৈক বেদুঈন এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল,

دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظر إِلَى هَذَا– وفى رواية : أَفْلح الرجلُ إِن صَدَقَ–

‘আপনি আমাকে এমন আমলের সন্ধান দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। ফরয ছালাত আদায় কর। ফরয যাকাত আদায় কর ও রামাযানের ছিয়াম পালন কর’। একথা শুনে বেদুঈন বলল, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর চেয়ে কিছু বেশীও করব না, কিছু কমও করব না’। (রাবী আবু হুরায়রা বলেন) অতঃপর যখন লোকটি চলে গেল, তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি কেউ কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে খুশী হ’তে চায়, তবে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, লোকটি সফলকাম হবে, যদি সে সত্য বলে থাকে’।[১৯] হাদীছটির কোন কোন বর্ণনায় হজ্জ বা ছিয়ামের উল্লেখ নেই। বর্ণনাকারীদের সেটি বর্ণনা করা বা না করার ভিত্তিতে *(মিরক্বাত)*। যুগে যুগে জান্নাতী বান্দাদের প্রকৃত লক্ষণ হবে এটাই যে, তারা বলবে আমি কুরআন-হাদীছে যা আছে তার চাইতে বাড়াবোও না, কমাবোও না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন!

(১৮) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ– (১) ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর’।[২০] অত্র হাদীছে আমীরের আনুগত্যকে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদতের সাথে যুক্ত করে বলা হয়েছে এবং একে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলব, সৎকর্ম ছোট হ’লেও তাকে ছোট মনে করা ঠিক নয়। তাই যত ছোটই হোক, সর্বদা সৎকর্মকেই জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ। আল্লাহ তুমি আমাদের অন্তরে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকুলতা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও! -আমীন!

১৮. *বুখারী হা/৭৫১২; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৫৫০।*
১৯. *বুখারী হা/১৩৯৭, ৪৬; মুসলিম হা/১৪, ১১; মিশকাত হা/১৪, ১৬।*
২০. *তিরমিযী হা/৬১৬; আহমাদ হা/২২২১৫; মিশকাত হা/৫৭১; ছহীহাহ হা/৮৬৭।*

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন!

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২০২২ সালের জন্য সুফারিশকৃত নতুন শিক্ষাক্রমে আগামী ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাহারের জোর দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে যাচ্ছে। যুবচরিত্র নষ্ট হচ্ছে, বেপরোয়া হয়ে উঠছে তরুণ প্রজন্ম। তাই শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য। তিনি বলেন, দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী চেতনাবোধ মুছে ফেলা ও নাস্তিক্যবাদের প্রসার ঘটানোর নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য সুকৌশলে এসএসসি পরীক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাদ দেওয়ার সুফারিশ হয়ে থাকতে পারে। ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত জাতি কখনও মেনে নেবে না। অতএব শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে *(দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে জানুয়ারী’২২-এ প্রকাশিত)*।

সূচীপত্র

مدرسة دار الوحي النموذجية

Darul Oahi Ideal Madrasah

দারুল ওহী আইডিয়াল মাদরাসা

ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত একটি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে বিশেষ ছাড়ে

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান : আলহাজ্জ মো: ইমাম হোসেন

ভর্তি চলছে ২০২২

পে-থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং হিফয বিভাগ

▌জেনারেল ▸ ◖ বালক বিভাগ- পে-থেকে অষ্টম শ্রেণী

◖ বালিকা বিভাগ- পে-থেকে পঞ্চম শ্রেণী

▌তাহফীযুল কুরআন বিভাগ (বালক)

আবাসিক

অনাবাসিক

ফুলটাইম ডে-কেয়ার

দারুল ওহী জামিলা খাতুন আইডিয়াল মহিলা মাদ্রাসা

(২০২৩ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ)

বর্তমান মাদরাসার প্রশাসনিক/আবাসিক ভবন

একাডেমিক ভবন

যোগাযোগ : বেলাটি, পোঃ আমদিয়া, থানা ও যেলা : নরসিংদী

০১৭৯৭-৫০৯৯১০, ০১৭৯৭-৫০৯৯১১, ০১৭৯৭-৫০৯৯১২

info@daruloahi.com Darul Oahi www.daruloahi.com

www.at-tahreek.com

দ্বীন প্রচারে ওয়ায-মাহফিল : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী সংবিধান হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং তার ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীছ। বিদায় হজ্জের দিনে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য এ দু'টি বস্তুকে মজবুতভাবে ধারণ করার জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন।[১] সেদিন তিনি উপস্থিত ছাহাবীদের নিকট থেকে তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালনের স্বীকৃতি গ্রহণ পূর্বক অনুপস্থিতদের নিকটে তার এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।[২] তিনি উম্মাহর উপরে দ্বীনি দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাকীদ দিয়ে অন্যত্র তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা পৌঁছে দাও'।[৩]

এই তাবলীগ বা পৌঁছে দেওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ওয়ায-মাহফিল। সমাজ সংস্কারে যার অবদান অনস্বীকার্য। ভারত উপমহাদেশে আবহমানকাল থেকে এ প্রথা সুপরিচিত। শীত মৌসুমে উৎসবের সাথে আয়োজন করা হয় ওয়ায-মাহফিলের। পাড়ায়-মহল্লায়, শহরে-বন্দরে সর্বত্র যুগযুগ ধরে চলে আসা এই আয়োজন এখন আরো অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ওয়ায-মাহফিল। হাতে থাকা এনড্রয়েড মোবাইল সেট অন করলেই ভেসে আসে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ওয়ায-মাহফিলের চিত্র। এ থেকে জ্ঞান আহরণ করা যায় খুব সহজে। কিন্তু ইদানীং কিছু অসাধু আয়োজক, চটকদার আলোচক, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক কাঁদা ছুড়াছুড়ি, আলোচকদের উচ্চ চাহিদা বা চুক্তিভিত্তিক বক্তৃতা, প্রশাসনিক বাধা ও উদ্ভট শর্তারোপ প্রভৃতি কারণে দাওয়াতের এই অনন্য মাধ্যমটি অনেকক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আলোচ্য নিবন্ধে পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমরা দ্বীন প্রচারে ওয়ায মাহফিলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং হালযামানায় এর বাস্তব চিত্র ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

ওয়ায-মাহফিল অর্থ :

'ওয়ায' (وعظ) আরবী শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, নছীহত, বক্তব্য। যেমন- وعظ: الْوَعْظُ وَالْعِظَةُ وَالْعَظَةُ وَالْمَوْعِظَةُ: النُّصْحُ وَالتَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ *(লিসানুল মীযান, ৭/৪৬৬ পৃ.)*।

আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। আলোচ্য আয়াতে 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ'র মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ 'ওয়ায' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। লোকমান কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে প্রদত্ত উপদেশকে আল্লাহ 'ওয়ায' বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ، 'আর স্মরণ কর, যখন লোকমান তার পুত্রকে ওয়ায (উপদেশ) করতে গিয়ে বলল, 'হে বৎস! আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*। অনুরূপভাবে অবাধ্য স্ত্রীদের উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) তাদের প্রহার কর' *(নিসা ৪/৩৪)*।

আর 'মাহফিল' (محفل) শব্দটি حفل শব্দ থেকে নির্গত। এটি একবচন। বহুবচনে محافل এর অর্থ হচ্ছে مَكَان الِاجْتِمَاع والمجلس 'সভা ও সমাবেশের স্থান' *(মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। যে সভা-সমাবেশে ওলামায়ে কেরাম ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপদেশ বা নছীহত পেশ করেন সে সমাবেশকে ওয়ায-মাহফিল বলা হয়।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এই পথের দাঈদের কথাকে আল্লাহ সর্বাধিক সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(হামীম সাজদা ৪১/৩৩)*। নবী-রাসূলগণের মিশন ছিল আল্লাহ্র দিকে মানুষকে ডাকা ও তাগূত্ব থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ শত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দাওয়াতী ময়দানে অবিচল ছিলেন। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو

১. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯।*
৩. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*

إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‘বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ সকলে দাঈ ইলাল্লাহ ছিলেন। জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে অহীর আলোয় আলোকিত করার জন্য তারা নিরন্তরভাবে দাওয়াতী কাজ করে গেছেন এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। ওয়ায-মাহফিল সেই দাওয়াতেরই একটি অন্যতম মাধ্যম। মানবসমাজের উন্নতি ও সংশোধনের জন্য এটি অতুলনীয় পন্থা। এর মাধ্যমে জনগণকে একত্রিত করে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানোর সুযোগ তৈরি হয়।

এদেশে যুগ যুগ ধরে শীত মৌসুমে ওয়ায-মাহফিলের আয়োজন হয়ে থাকে। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী প্রায় পাঁচ মাসব্যাপী দেশের আনাচে-কানাচে এই উৎসবমুখর আয়োজন চলে। দূর-দূরান্তের নামী-দামী আলেম-ওলামাগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর দীর্ঘ সময় যাবত নছীহত করেন। এতে মানুষের মধ্যে দ্বীনি জাযবা তৈরী হয় এবং ইসলামের বিধান পালনে কিছু মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনেকে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হন। এভাবে ক্রমান্বয়ে সমাজে দ্বীনি আবহ সৃষ্টি হয়।

নিকট অতীতে গ্রামে-গঞ্জে যেভানে নাচ-গান-যাত্রা ইত্যাদি অশালীন অনুষ্ঠানের আয়োজন হ’ত ইদানীং তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি এলাকা বিশেষে একেবারে উঠে গেছে। সে জায়গাটা দখল করেছে ওয়ায-মাহফিলের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো। যারা এক সময় পালাগানের আসর বসাতো তারাই এখন ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে দ্বীনী অনুষ্ঠান আয়োজনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সমাজকে সংস্কার করতে ওয়ায-মাহফিল, দাওয়াতী সভা-সমাবেশ, ইসলামী জালসা-সম্মেলন, তাবলীগী ইজতেমা ইত্যাদি প্রকাশ্য ধর্মীয় জনসমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

ওয়ায-মাহফিলের হালচিত্র :

ওয়ায-মাহফিলের ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি হালে কিছু কিছু কারণে এর নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একশ্রেণীর দ্বীন জ্ঞানহীন আলোচকের কারণে ওয়াযের মঞ্চকে অনেকে বিনোদন মঞ্চ হিসাবেও আখ্যা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আবার অনেকে রাজনৈতিক স্বার্থে এই মঞ্চ ব্যবহার করছে। অনেক আলোচক মিথ্যা বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে, কেউ যিকরের নামে গর্হিত লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, কেউ পারস্পরিক অশ্রাব্য গালাগালি ও গীবত-তোহমদের মাধ্যমে এই মঞ্চটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। দ্বীনের আলো বিতরণের এই মঞ্চটি যেন পাঁচমিশালী মঞ্চে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কতিপয় আপত্তিকর বিষয় এখানে তুলে ধরা হ’ল, যেগুলো থেকে ওয়ায মাহফিলকে নিরাপদ রাখা খুবই যরূরী।-

উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনী পরিবেশন :

দেশের নামী-দামী অনেক আলোচক আছেন, যাদের আলোচনায় কুরআন-হাদীছের চাইতে বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনীই বেশী শুনা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য দিলেও এদের কারো কারো মুখ থেকে কুরআন-হাদীছ তেমন শুনা যায় না।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। রামাযান মাস। ঢাকা থেকে দাওয়াতী সফরে কুমিল্লা যাওয়ার জন্য বাসে চড়েছি। বাসের সুপারভাইজার হয়ত রামাযানের বরকতে গান চালু না করে ওয়ায চালু করেছেন। জনৈক কোকিল কণ্ঠী বক্তার কবরের আযাব বিষয়ে বক্তব্য শুনতে লাগলাম। ‘ত’ আদ্যাক্ষরের ঐ বক্তার দেড় ঘণ্টার বক্তব্যে আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরে একটি আয়াত বা হাদীছও শুনতে পেলাম না। উপরন্তু এক পীরের মর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, *ঐ পীরবাবার মৃত্যুর পর যখন তাকে দাফন করা হয় তখন মুনকার-নাকীর ফেরেশতা তার কবরে ঢুকতেই তিনি জোরে তাদেরকে থাপ্পড় লাগিয়ে দেন। মুনকার-নাকীর তখন আল্লাহ্র নিকট নালিশ করেন যে, হে পরওয়ারদেগার! তোমার কোন্ বান্দার নিকটে আমাদের পাঠালে যে, প্রশ্ন করার আগেই আমাদেরকে থাপ্পড় মেরে দিল। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কবরে ঢুকার সময় তাকে সালাম দিয়েছিলে? ফেরেশতারা বলল, না। আল্লাহ বললেন, থাপ্পড় মেরে ঠিকই করেছে। আগে আমার এই বুজুর্গ বান্দাকে সালাম দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও, তারপর তাকে প্রশ্ন কর। নাঊযুবিল্লাহ।*

আবার কেউ জাল-যঈফ হাদীছ ও ভিত্তিহীন কথা দ্বারা ওয়ায করেন। নিজেদের আচরিত মাযহাব, মতবাদ ও তরীকার বিপক্ষে ছহীহ হাদীছ জানলেও তারা বলেন না। রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বানানো জাল বা মিথ্যা হাদীছ দ্বারা দ্বীন প্রচার করছেন। পরিণামে তারা নিজেদের আখেরাত বিনষ্ট করছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ، ‘তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ কর না। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ‘যে ব্যক্তি আমার উপরে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়’।[৫] সেকারণ বক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যিনি প্রকৃতপক্ষে কুরআন-হাদীছের জ্ঞান রাখেন এবং দলীলভিত্তিক কথা বলেন কেবলমাত্র সেই আলেমকেই দাওয়াত দেওয়া উচিত।

আলোচকদের অঙ্গভঙ্গি ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ :

কোন কোন আলোচকের অঙ্গভঙ্গি ও ভাষা প্রয়োগ খুবই আপত্তিজনক। সিনেমার অভিনেতা ও গায়ক-গায়িকাদের

৪. *বুখারী হা/১০৬।*
৫. *বুখারী হা/১০৭।*

নকল করে তারা শ্রোতাদের মাত করে রাখেন। অর্থহীন ও অশালীন সঙ্গীত পরিবেশন করেন, লজ্জাকর অঙ্গভঙ্গি করেন। দৃশ্যত মনে হয় যেন এটা কোন ওয়াযের মঞ্চ নয়, বরং কোন নাট্যমঞ্চ। কুরআনের ভাষায় এরা 'লাহওয়াল হাদীছ' বা বাজে কথা খরীদকারী। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، 'লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা তাদের অজ্ঞতাবশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং তারা আল্লাহ্র পথকে বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(লোকমান ৩১/৬)*। এখানে 'বাজে কথা' অর্থ গান-বাজনা। যা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে বিমুখ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ– 'দু'টি অভিশপ্ত ও পাপিষ্ঠ শব্দ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি। (১) বাজনার শব্দ ও নাচ-গানের সময় শয়তানের সুরধ্বনি (২) বিপদের সময় মুখ ও বুক চাপড়ানোর ক্রন্দন ধ্বনি'।[৬] সুতরাং কুরআন হাদীছ বাদ দিয়ে এসব অভিনয়, সংগীত ও কমেডি আলোচনা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নেই। তাই অন্ত সারশূন্য এসমস্ত আলোচনা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ফিরে আসা উচিত।

পরচর্চা ও পরনিন্দা : পরচর্চা বা পরনিন্দা একটি জঘন্য কর্ম। আরবীতে যাকে 'গীবত' বলা হয়। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাকে আল্লাহ মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। গীবতের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 'তোমরা কি জান 'গীবত' কী? তাঁরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপসন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি না থাকে তাহ'লে তুমি তাকে অপবাদ দিলে'।[৭]

ইদানীং একশ্রেণীর আলোচক ওয়াযের মঞ্চকে এই ন্যক্কারজনক কাজেও ব্যবহার করছে। হাযার হাযার জনতার সামনে অন্য একজন আলেম সম্পর্ক দেদারছে গীবত করা হচ্ছে। অন্যকে অপদস্ত করে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির কোশেশ করা হচ্ছে। এটা এতটাই জঘন্য যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ব্যতীত আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ– 'যে ব্যাক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানী বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[৮]

পোষ্টারে দলীয় নেতা-কর্মীদের নামের ফিরিস্তি : আজকাল ওয়ায-মাহফিলের পোষ্টারের দিকে তাকালে দেখা যায় বিশাল নামের ফিরিস্তি। দলীয় নেতা-কর্মীদের নামের তালিকার ভিড়ে মূল আলোচকের নামই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কোন কোন মাহফিলে একচেটিয়া ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের নাম। আবার কোথাও উভয় দলকে সন্তুষ্ট করতে ধারাবাহিকভাবে উভয়দলের নেতাদের নাম স্থান পায় পোষ্টারে। মাহফিল কর্তৃপক্ষ কাউকেই যেন অসন্তুষ্ট করতে চান না। পাশাপাশি আর্থিক সুবিধা পেতে বাদ দেওয়া হয় না স্থানীয় ও পরিচিত ব্যবসায়ীদের নামও। পুরো পোষ্টার জুড়ে শুধুই নামের তালিকা। এ যেন নাম ও পদবীর এক প্রদর্শনী। তাছাড়া নামের অবস্থান নিয়েও চলে গোলমাল, রাগ-অনুরাগ ও অভিমান। তিনি এত বড় মাপের নেতা কেন তার নামটা অমুকের নামের আগে দেওয়া হ'ল না? এ নিয়ে চলে চাপা ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং পরিণামে মাহফিল বয়কট। কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করে অনুষ্ঠান বাঞ্চালেরও অপচেষ্টা চালানো হয়। দ্বীনি দাওয়াতের এই স্বচ্ছ মজলিসটিকে করা হয় কালিমাযুক্ত। বর্তমানে আরেকটি অঘোষিত নিয়ম চালু হয়েছে যে, যে এলাকায় মাহফিল হবে সে এলাকার এমপিকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রধান অতিথি করতে হবে। চাই তিনি উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, জানুন বা না জানুন। নাম পোষ্টারে দৃশ্যমান হ'লেই হ'ল। এলাকার অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কোন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে উক্ত চেয়ার দেওয়া যাবে না। অন্যথায় মাহফিলের অনুমতি মিলবে না।

রাজনৈতিক প্রচারণার ক্ষেত্র ওয়ায-মাহফিল : গ্রাম-গঞ্জের ওয়ায-মাহফিল আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের প্রচারণার মঞ্চে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও দলীয় নেতারা অথবা সম্ভাব্য প্রার্থীরা মাহফিলগুলোকে তাদের দলীয় প্রচারণার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। এমনকি এরা এতটাই

৬. *তিরমিযী হা/১০০৫; ছহীহাহ হা/২১৫৭; কুরতুবী হা/৪৯২১।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮।*
৮. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।*

প্রভাব বিস্তার করে যে, বক্তৃতা চলাবস্থায় মঞ্চে আসলে চলমান বক্তৃতা থামিয়ে দিয়ে তাদেরকে বক্তব্য দিতে সময় দিতে হয়। এতে আলোচকের আলোচনায় ছন্দপতন হয়। শ্রোতাদের মনোযোগ বিনষ্ট হয়। সময়ের অপচয় হয়। সর্বোপরি এটি দাওয়াতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। তারপরও বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষ এমন সুযোগ দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, এই নেতারা যদি কিছু সময় বসে বক্তৃতা শ্রবণ করতেন, তাহ'লে কতই না সুন্দর হ'ত এবং তাদের উপকারে আসতো। কিন্তু আদৌ তারা বক্তৃতা শুনতে আসে না।

হাদিয়া না বিনিময়? ওয়ায-মাহফিলে বক্তাদের হাদিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এ নিয়ে আজকাল অনেক বাতচিত হচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যেন ইসলামিক আলোচকদের দরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন বক্তার ডিমান্ড লাখ টাকাও ছাড়িয়েছে। দূর অতীতে দ্বীনের দাঈগণ পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। নিকট অতীতেও রিক্সা, ভ্যান, মোটর সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, নৌকা ইত্যাদিতে চড়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ আজকাল আমরা প্রাইভেটকার, মাইক্রো, বিমান এমনকি হেলিকপ্টারে চড়ে দাওয়াতী কাজ করছি। তারপরও তাদের সেই খুলূছিয়াত আমাদের মধ্যে নেই। তাদের সেই নিঃস্বার্থ দাওয়াত এখন শুধুই স্মৃতি। আমাদের সবকিছুর মধ্যে কেন যেন স্বার্থপরতা জড়িয়ে আছে। হয় তা আর্থিক বা মার্যাদাগত অথবা অন্য কোন বিষয়ে। অগ্রিম বায়না না হ'লে আমরা মাহফিলের তারিখ দেই না। কাঙ্ক্ষিত হাদিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে বলি ডেইট ফাঁকা নেই। আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রয়োজন হয়। নিজে না চাইতে পারলেও পিএস বা গাড়ীর ড্রাইভারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাছিল করা হয়। আমরা এতটাই নিচে নেমেছি যে, বিকাশে হাদিয়া পাঠালে বিকাশ খরচটাও চাইতে আমাদের বাধে না। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া খুবই যরূরী।

হাদিয়া অর্থ উপহার বা উপঢৌকন। হাদিয়া ইসলামে সিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) হাদিয়া বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, تَهَادُوا تَحَابُّوا 'তোমরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় কর, তাহ'লে তোমাদের মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে'।[৯] মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، 'রাসূল (ছাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন'।[১০] আবূ সালামা বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، 'রাসূল (ছাঃ) হাদিয়া খেতেন, কিন্তু ছাদাক্বা খেতেন না'।[১১] সুতরাং এন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে বক্তাকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হাদিয়া অথবা পাথেয় গ্রহণ করা জায়েয। তবে এটি যদি বক্তার ডিমান্ড বা চাওয়া হয় বা দরকষাকষি করে নির্ধারণ করা হয়, তবে তা আদৌ সিদ্ধ নয়। তখন এটি আর হাদিয়া থাকে না, বিনিময় হয়ে যায়। নবী-রাসূলগণ এমনকি ছাহাবীগণের কেউ দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করতেন না। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، 'আমি তোমাদের নিকটে এজন্য (দ্বীন প্রচারের জন্য) কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে' *(শু'আরা ২৬/১০৯)*। হূদ (আঃ) স্বীয় কওমের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ، 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না। এর বিনিময় তো কেবল তাঁর কাছেই রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝ না?' *(হূদ ১১/৫১)*। রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ 'তুমি ওদের বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় চাই না এবং আমি এতে ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ছোয়াদ ৩৮/৮৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا 'তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট এই দাওয়াতের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না। কিন্তু যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মাধ্যমে তার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) পথ অবলম্বন করতে পারে' *(ফুরকান ২৫/৫৭)*। তিনি বলেন, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِيْنَ 'বলে দাও যে, এর (অর্থাৎ কুরআন বা দ্বীন প্রচারের) বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। বস্তুতঃ এই কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র' *(আন'আম ৬/৯০)*। আল্লাহ আরো বলেন, اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ 'তোমরা অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত' *(ইয়াসীন ৩৬/২১)*। উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, দ্বীন প্রচারের কোন দুনিয়াবী পারিশ্রমিক বা বিনিময় হয় না। কেননা এর বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহই দিবেন।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়োজকদের গাফেলতীও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাহফিল শেষ হওয়ার পর আয়োজকদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সঠিকভাবে পাথেয় দেওয়া হয় না। বক্তার অবস্থান, থাকা-খাওয়া অথবা ফিরে যাওয়া কোনটারই উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে না। যতটা না মাহফিলের আগে বক্তার কদর থাকে মাহফিল শেষ হ'লে এর কানাকড়িও আর অবশিষ্ট থাকে না। এই আচরণ চরমভাবে নিন্দনীয়।

ফেইসবুক ও ইউটিউবারদের চটকদার হেডলাইন :

একশ্রেণীর ফেইসবুকার ও ইউটিউবার আছেন, যারা

৯. *বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪।*
১০. *বুখারী হা/২৫৮৫।*
১১. *দারেমী হা/৬৮ সনদ হাসান।*

নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ওয়ায-মাহফিল আপলোড করে থাকেন। ফলে ভিউআর বা দর্শক বৃদ্ধির জন্য তারা এমন সব অংশ কাটপিচ করে চটকদার হেডলাইন করে পেইজে ছেড়ে দেন, যা দেখলে যে কেউ ভিডিওটি দেখতে বাধ্য হবে। আর ভিউআর বেশী হ'লে ইউটিউব থেকে তার আয়ও বেশী হবে। এই ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে বক্তৃতার কোন অংশে নেগেটিভ বা সমালোচনামূলক কথা থাকলে সেটিই বেশী প্রচার পায়। এরচেয়ে বহুলাংশে বেশী পরিমাণ পজেটিভ কথা থাকলেও তা প্রচার পায় না। এক পর্যায়ে বিরোধী পক্ষও পাল্টা জওয়াব দেয়। ফলে কাঁদা ছোড়াছুড়ি লেগেই থাকে। মাঝখানে ফায়েদা হাছিল করে ইউটিউবার। এমনই একজন পেশাদার ভিডিওম্যানের সাথে ৩/৪ বছর আগে বাসে পাশাপাশি সিটে বসে ঢাকা থেকে রাজশাহী ফিরছিলাম। রাজশাহীতে তার ভিডিওর দোকান আছে। পূর্বপরিচিত ও অমুসলিম। জিজ্ঞেস করলাম, দাদা ঢাকা কবে এসেছিলেন? বললেন, ঢাকা নয়, অমুক বক্তার বক্তব্য ভিডিও করার জন্য ময়মনসিংহে এক মাহফিলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ঢাকা হয়ে রাজশাহী ফিরছি। বিষয়টি সেসময় ভাল না বুঝলেও এখন ঠিকই এর কারণ বুঝতে পারছি।

সংখ্যা কখনো সফলতার মানদণ্ড নয় :

ওয়ায-মাহফিলের সফলতা বলতে আমরা সুন্দর প্যাণ্ডেল, আকর্ষণীয় মঞ্চ, জাকজমকপূর্ণ লাইটিং, উন্নত সাউণ্ড সিস্টেম, নামি-দামী আলোচকের বক্তব্য ও উপচেপড়া শ্রোতার উপস্থিতকেই বুঝি। কিন্তু আসলেই কি দ্বীনী মাহফিলের সফলতা অধিক পরিমাণ শ্রোতার অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে?

প্রকৃতপক্ষে ওয়ায-মাহফিলের সফলতা কিসে তা চিন্তা করতে হ'লে সর্বাগ্রে এর উদ্দেশ্য কি তা ভাবতে হবে। মূলতঃ শ্রোতাদেরকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। সেকারণ স্বল্প সংখ্যক উপস্থিতির মাহফিলেও যদি এই উদ্দেশ্যে সাধন হয়, তবে সেটিই হবে সফল মাহফিল। পক্ষান্তরে মাঠভর্তি শ্রোতার মাহফিলের আলোচনা যদি শ্রোতাদের মনে কোন রেখাপাত না করে, তাদেরকে হেদায়াতের রাজপথে চালিত করতে না পারে তবে তা কখনো সফল মাহফিল নয়। কেননা সংখ্যা কখনো সফলতার মানদণ্ড নয়। মাত্র একজন শ্রোতার হেদায়াতই সর্বোচ্চ মূল্যবান লাল উট কুরবানীর চেয়ে বেশী ছওয়াবের। যেমনটি নায়েম দূর্গ বিজয়াভিযানে প্রেরিত সেনাপতি আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন যে, فَوَاللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ 'আল্লাহ্র কসম তোমার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তিও হোদায়াত লাভ করে তবে সেটি তোমার জন্য লাল উট কুরবানীল চাইতেও উত্তম'।[১২] তাই কেবল জনসাধারণের মন জয় করা লক্ষ্য নয় বরং সামনে থাকা উচিত তাদের জীবন পরিবর্তনের লক্ষ্য। মাহফিলের সফলতা নির্ণয় করা উচিত এ মানদণ্ডকে সামনে রেখে, উপস্থিত শ্রোতাদের সংখ্যা দিয়ে নয়।

সরকারী প্রতিবন্ধকতা :

ইতিপূর্বে ওয়ায-মাহফিলের জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হ'ত না। যতদূর মনে পড়ে ২০০৫ সালের পর থেকে ওয়ায-মাহফিল বা ইসলামী জালসার জন্য সরকারী অনুমতির নিয়ম চালু করা হয়। ফলে দ্বীন প্রচারে আরো একধাপ জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং ওয়ায-মাহফিল দলীয় নেতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার হাতিয়ারে পরিণত হয়। যিনি যেখানে ক্ষমতাসীন বা প্রভাবশালী সেখানে তার ইশারায়ই চলে সবকিছু। তিনি চাইলে অনুমতি মিলে, না চাইলে মিলে না। প্রথমে সংশ্লিষ্ট যেলা প্রশাসক বরাবরে লিখিত আবেদন করতে হয়। যেলা প্রশাসক তখন তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করার জন্য যেলা পুলিশ সুপার বরাবরে চিঠি দেন। পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইন চার্জকে (ওসি) এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য লিখেন। থানার ওসি তখন একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দেন তদন্ত করার জন্য। অতঃপর এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় একইভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন থানা ওসি হয়ে এসপি এবং এসপি হয়ে ডিসির দফতরে পৌঁছার পর ইতিবাচক প্রতিবেদন হ'লে মাহফিলের অনুমতি পাওয়া যায়, আর নেতিবাচক হ'লে অনুমতি পাওয়া যায় না। এ হ'ল সাদা চোখের বিবরণ। কিন্তু অন্তরালে থাকে অনেক কিছু। যদি দেখা যায়, মাহফিলের আয়োজক, আলোচক কেউ ভিন্নমতাবলম্বী তখন নেগেটিভ ইশারায় সবকিছু হয়। তবে কোথাও কোথাও প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের বাড়াবাড়িও চরমে পৌঁছে। ইসলামী কোন অনুষ্ঠানের কথা শুনলে তাদের যেন গাত্রদাহ শুরু হয়। অথচ গান-বাজনা, যাত্রা বা যেকোন ধরনের কনসার্ট-এর আয়োজনে শুধু অনুমিত কেন সহযোগিতা করতেও তাদের কোন আপত্তি থাকে না। দুর্ভাগ্য আমাদের, মুসলমানদের দেশে জন্ম নিয়ে আজ ইসলামের কথা বলতে এত বাধা। যেখানে মহান আল্লাহ দ্বীন প্রচারের কথা বলেছেন, বারবার তাকীদ দিয়েছেন, তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্বীন প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে মুসলিম দেশের এই মুসলিম দায়িত্বশীলরা দ্বীন প্রচারের জন্য অনুমতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে নিজেদেরই ক্ষতি করছেন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দা করুন!

শেষ কথা : একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও দ্বীনি সমাজ গড়ে তোলার জন্য দাওয়াতের কোন বিকল্প নেই। আর ওয়ায-মাহফিল দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই স্বচ্ছ মাধ্যমটি যেন কখনো অস্বচ্ছ না হয়, সুবিধাভোগী ও স্বার্থপর শ্রেণী কর্তৃক কালিমালিপ্ত না হয়, সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আলেম ও বক্তাদেরকেও এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কথা বলায় হ'তে হবে আরো শালীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলভিত্তিক বাণী নিঃস্বার্থভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হ'তে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবেই নেমে আসবে এলাহী মদদ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

১২. *বুখারী হা/২৯৪২।*

দাওয়াত ও সংগঠন

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত অপরিহার্য। কারণ দাওয়াত ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। সমাজ সংস্কারে এবং মানুষের আক্বীদা-আমল সংশোধনে দাওয়াতের কোন বিকল্প নেই। নবী-রাসূলগণ স্বীয় উম্মতকে দ্বীনে হকের দিকে ফিরিয়ে আনতে এবং হকের উপরে টিকিয়ে রাখতে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের মিশনকে সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের পথ ধরেই বর্তমানে ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ নিবন্ধে দাওয়াতী ময়দানে সংগঠনের ভূমিকা আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াত ও সংগঠনের সংজ্ঞা :

'দাওয়াত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ করা, দো'আ বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এখানে দাওয়াত বলতে বুঝায় আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত। পারিভাষিক অর্থে দাওয়াতের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هي : الدعوة إلى الله الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا. 'আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত অর্থ হচ্ছে তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনা এবং তিনি যেসব বিষয় খবর দিয়েছেন সেসব সত্য বলে স্বীকার করা, আর তাঁরা যেসব আদেশ দিয়েছেন তা মান্য করা'।[১]

'সংগঠন'-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে জামা'আত (الجماعة)। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একত্রিত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সমবেত হওয়া ইত্যাদি। এটা বিচ্ছিন্নতার বিপরীত। পারিভাষিক অর্থে- اَلْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى هَدَفٍ تَحْتَ إِمَارَةٍ، 'নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ জনতাকে জামা'আত বলা হয়'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ هِيَ الْاِجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ إِسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِيْنَ، 'জামা'আত হচ্ছে একত্রিত হওয়া। এটি বিচ্ছিন্নতার বিপরীত। যদিও জামা'আত শব্দটি যেকোন ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়'।[২]

দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত :

দাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনে বিস্তর বিবরণ এসেছে। তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ، 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সতর্ক হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার উপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়'।[৩]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন,

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها من الفرائض، وصرح العلماء أن الدعوة إلى

১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৫৭।*
২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৫৭।*
৩. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*

www.at-tahreek.com

الله عز وجل فرض كفاية، بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة،

'কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব ও ফরয। বিদ্বানগণ আরো সুস্পষ্ট করেছেন যে, দাঈদের দাওয়াত প্রদানের অঞ্চলভেদে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ফরযে কিফায়া। কারণ প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চল দাওয়াতী কর্মতৎপরতার মুখাপেক্ষী। সুতরাং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে অন্যদের উপর থেকে এর ফরযিয়াত রহিত হয়ে যাবে। তখন অন্যদের ক্ষেত্রে এটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদায় পরিণত হবে'।[৪] তিনি আরো বলেন,

الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الإسلامية، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، وقد أمر الله بها في كتابه الكريم وأثنى على أهلها غاية الثناء.

'আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব সমূহের অন্তর্গত। এটা রাসূল (ছাঃ) ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর অনুসারীদের পথ। এ বিষয়ে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাঈদের খুব প্রশংসা করেছেন'।[৫]

সংগঠনের গুরুত্ব :

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে জামা'আতবদ্ধ থাকার ব্যাপারে মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং উৎসাহিত করা হয়েছে। আর কুরআনে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহ একটি জাতি। তারা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ، 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/২০৫)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ، 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই' *(আন'আম ৬/১৫৯)*।

এসব আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ বিচ্ছিন্নতাকে নিষেধ করেছেন। বরং ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। জামা'আতবদ্ধ থাকার ব্যাপারে হাদীছেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পসন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপসন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পসন্দ করেন যে, ১. তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে। ২. তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ৩. তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করবে এবং পরস্পর বিভক্ত হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেন ১. ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা' (সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করা)।[৬]

হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে,

فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

'যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহ'লে আমাকে কী করার নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, তখন যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'তখন সকল ভ্রান্ত দল পরিত্যাগ করে সম্ভব হ'লে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়'।[৭] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ،

৪. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায, ১/৩৩০, ৮/৪০৯, ২৭/৬৭।*
৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায, ২/২৪১, ২৭/১৭০।*
৬. *আহমাদ হা/৮৭৮৫; মুসলিম হা/১৭১৫; ছহীহাহ হা/৬৮৫।*
৭. *বুখারী হা/৩৬০৬,৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং নিজের দ্বীন ত্যাগকারী মুসলিম জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি'।[৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّاكِبُ شيطانٌ، والرَّاكِبان شيطانان، والثلاثةُ رَكبٌ، 'একাকী সফরকারী হচ্ছে একটি শয়তান, আর একত্রে দু'জন সফরকারী দু'টি শয়তান। তবে একত্রে তিনজন সফরকারীই হচ্ছে প্রকৃত কাফেলা'।[৯] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، 'তোমাদের জন্য আবশ্যিক হ'ল জামা'আতবদ্ধ থাকা। আর তোমরা বিচ্ছিন্নতা হ'তে সাবধান থেকো। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দু'জন হ'তে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন জামা'আতকে আবশ্যক করে নেয়'।[১০]

এসব হাদীছ দ্বারা জামা'আতবদ্ধ থাকার আবশ্যকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান করা হয়েছে। মুসলমানরা সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে এবং তার হক সমূহ যথাযথভাবে আদায় করলে তারাও ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম ও তাদের অনুসারীদের ন্যায় কল্যাণ লাভ করবে।

জামা'আত দুই প্রকার। ১. জামা'আতে আম্মাহ তথা ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন ও ২. জামা'আতে খাছছাহ তথা বিশেষ সংগঠন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন জামা'আতে আম্মাহর পর্যায়ভুক্ত। স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানই এ সংগঠনের আমীর। ইসলামী শরী'আতে তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' হিসাবে অভিহিত হবেন। তিনি ইসলামী আইনের আলোকে প্রজাপালন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন। এই ইমারতকে 'ইমারতে মুলকী'ও বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ইমারতে মুলকী কায়েম করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বাইরে অন্যান্য সকল সংগঠনই জামা'আতে খাছছার পর্যায়ভুক্ত। এ সংগঠন মুসলিম-অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে কায়েম করা সম্ভব। ইসলামী শরী'আত মতে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কোন স্থানে যদি তিনজন মুমিনও থাকেন, তবে সেখানে একজনকে আমীর করে জামা'আত বা সংগঠন কায়েম করা অপরিহার্য। এ জামা'আত যত বড় হবে ততই ভাল। একে 'ইমারতে শারঈ' বলা হয়। তিনি শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন না, কিন্তু অবশ্যই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে শারঈ অনুশাসন কায়েম করবেন।

৮. *বুখারী হা/৬৮৭৮; মুসলিম হা/১৬৭৬।*
৯. *আবুদাউদ হা/২৬০৭; তিরমিযী হা/১৬৭৪; মিশকাত হা/৩৯১০।*
১০. *তিরমিযী হা/২১৬৫; ছহীহাহ হা/৪৩০।*

জামা'আতে খাছছাহ বা নির্দিষ্ট সংগঠন কায়েমের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে নানাভাবে নির্দেশ এসেছে *(আলে ইমরান ৩/১০৩-১০৪, ১১০)*।

নবী করীম (ছাঃ)ও এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম'।[১১]

সাংগঠনিক জীবনের উপকারিতা :

১. আল্লাহ্র রহমত লাভ :

জামা'আত বা সংগঠনের উপরে আল্লাহ্র রহমত থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ থাকা রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা আযাব'।[১৩]

২. শক্তি বৃদ্ধি করা :

পার্থিব জীবনে সংগঠন একটি বিশাল শক্তি। ঐক্যবদ্ধ জনবল না থাকলে অস্ত্রশক্তিও কোন কাজে আসে না। এজন্য আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ 'কাফিরদের মুকাবিলার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত করবে' *(আনফাল ৮/৬০)*। ফলে সংগঠনের কারণে আল্লাহ বিরোধীরা সমীহ করে।

জামা'আতবদ্ধ জীবনের আরেকটি উপকার হ'ল, এর মাধ্যমে সমাজে অনেক যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে কাজ করার মধ্যে এক অসাধারণ আনন্দ ও উৎসাহ পাওয়া যায়। একে অপরের দুঃখে-বিপদে এগিয়ে আসার মানসিকতা তৈরী হয়। সংগঠন না থাকলে এসব গুণাবলী মানুষের মধ্যে বিকাশ লাভ করে না। অতএব সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা।

১১. *আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪।*
১২. *তিরমিযী হা/২১৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/১৭৩, হাদীছ ছহীহ।*
১৩. *ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯।*

৩. সুসম্পর্ক বৃদ্ধি :

সংগঠনভুক্ত কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল' *(ফাতহ ৪৯/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، 'একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্যে প্রাসাদস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করালেন'।[১৪] সুতরাং সংগঠন একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে।

৪. শয়তানের কবল থেকে রক্ষা :

শয়তান মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ হ'লে শক্তিতে পরিণত হবে। এটা সে চায় না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، 'শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে মুছল্লীরা তার ইবাদত করবে। তবে সে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয়নি'।[১৫] আর একাকী থাকলে শয়তান সঙ্গী হয় এবং সংঘবদ্ধ থাকলে শয়তান দূরে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، 'তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হ'তে সাবধান থাক। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির (বিচ্ছিন্নজনের) সাথে থাকে এবং সে দু'জন হ'তে অনেক দূরে অবস্থান করে'।[১৬]

৫. সামাজিক শৃংখলা :

সংগঠন সমাজজীবনে শৃখংলা শেখায়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। মানুষের জন্য ভাবতে শেখায়। আত্মকেন্দ্রিক না করে বহুকেন্দ্রিক করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أُولِى الأَمْرِ وَلُزُوْمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، 'কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর তিনটি বিষয়ে খিয়ানত করে না- ১. একমাত্র আল্লাহ্র জন্য আমলকে খালেছ করা, ২. মুসলিমদের নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দান, ৩. মুসলিমগণের জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা তাদের দো'আ তাদের পেছনের সকলকে বেষ্টন করে নেয়'।[১৭]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَهَذِهِ الثَّلَاثُ تَجْمَعُ أُصُولَ الدِّينِ وَقَوَاعِدَهُ وَتَجْمَعُ الْحُقُوقَ الَّتِي لِلَّهِ وَلِعِبَادِهِ، وَتَنْتَظِمُ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. 'এ তিনটি বিষয় দ্বীনের মূলনীতি ও বিধানকে একত্রিত করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার হক সমূহকে জমা করেছে। আর এতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে'।[১৮]

৭. দ্বীনের হেফাযত :

সংগঠন ছাড়া বা জামা'আতবদ্ধ জীবন ব্যতিরেকে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনাই করা সম্ভব নয়। ইসলামী আদর্শের প্রথম ও প্রধান উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং দ্বিতীয় উৎস সুন্নাতে রাসূল। এতদুভয়ের শিক্ষা ও দর্শন আলোচনা করলে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ দেখা যায় না। কুরআন-সুন্নাহ্র আহ্বান হয় গোটা মানবজাতির জন্যে, আর না হয় মানুষের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলের জন্যে। কেবলমাত্র আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু সেই জবাবদিহিতা থেকে বাঁচতে হ'লেও এই দুনিয়াতে সামষ্টিকভাবে দ্বীন মেনে চলার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। এছাড়া শিরক ও বিদ'আত থেকে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য ইসলামী সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, 'ঈমানদার নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হ'ল সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান। তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। তাদের প্রতি সত্বর আল্লাহপাক অনুগ্রহ করবেন। মহান আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত' *(তওবা ৯/৭১)*। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা। এর থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। আর এ কাজ করতে গেলেই সংগঠনের প্রয়োজন। কাজেই ইসলামী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক।

৮. অহির বিধান প্রতিষ্ঠা :

সমাজে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। কেননা শুধু প্রচারের জন্য বরং বাস্তব জীবনে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যই নবীগণের আগমন হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। *[ক্রমশঃ]*

---

১৪. বুখারী হা/৪৮১; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।
১৫. মুসলিম হা/২৮১২; আবূদাঊদ হা/৩৩৭৪; আহমাদ হা/১৪৩৬৮; ছহীহাহ হা/১৬০৮; ছহীহুল জামে' হা/১৬৫১।
১৬. তিরমিযী হা/২১৬৫; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬৩; ছহীহাহ হা/৪৩০।
১৭. আহমাদ হা/১৩৩৭৪; তিরমিযী হা/২৬৫৮; ছহীহাহ হা/৪০৪।
১৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ১/১৮।

দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমাজে তার প্রভাব

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহ্র। আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার কাছে ক্ষমা চাই এবং তার কাছে ফিরে যাই। আমাদের মনের অনিষ্টতা বা কুচিন্তা থেকে এবং আমাদের কার্যাবলির কদর্যতা থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চাই। আল্লাহ যাকে সুপথ দেন তাকে বিপদগামী করার কেউ নেই। আর যাকে বিপদগামী করেন তাকে সুপথে আনারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুপথের দিশা ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহ্র রিসালাত (বার্তা) মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন, আমানত প্রত্যার্পণ করেছেন, উম্মতের কল্যাণ করেছেন এবং আল্লাহ্র পথে যথার্থভাবে সংগ্রাম করেছেন। অনন্তর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর ছাহাবীগণের উপর এবং তাদের উপর, যারা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সুচারুরূপে তাঁদের অনুসরণ করবেন। অতঃপর প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ, এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমাজে তার প্রভাব', যা সকলের কিংবা অধিকাংশ মানুষের জানা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শরী'আতে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর উম্মতের নিকট দাওয়াত দানের একটি বিশেষ আদেশ পৌঁছে দিতে বলেছেন। সেই আদেশটি হচ্ছে, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ '(হে রাসূল,) তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

মুহাম্মাদী দাওয়াতের স্বরূপ :

নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সমগ্র কুরআনের কথা বলতে আদিষ্ট হয়েছেন। তিনি আল্লাহ্র বাণী আল্লাহ্র বান্দাদের নিকটে পৌঁছে দিতেও আদিষ্ট হয়েছেন। কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বীয় উম্মতের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে আদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।... আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ 'তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্যের খবর রাখি না' *(আন'আম ৬/৫০)*। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল যে, আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তার পক্ষ থেকে কোন কথা বলে দেওয়ার জন্য আদেশ জারী করেন তখন বিষয়টি যে সতর্ক যত্নের দাবীদার তা আমাদের খুব খেয়াল করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলছেন, 'এটাই আমার পথ' এখানে 'হা-যিহী' বা 'এটাই' ইঙ্গিতকারী শব্দ। আর ইঙ্গিতকৃত বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী *'আমি আল্লাহ্র দিকে ডাকি জেনে-বুঝে। আমি ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারা ডাকে'*। অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণের দায়িত্বই হচ্ছে যে, তারা জেনে-বুঝে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকবেন।

নবী করীম (ছাঃ) অন্য সকল নবী-রাসূলের মতই আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দানের এই সুমহান ও সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী ছিলেন। তবে এ দাওয়াত হবে জেনে-বুঝে। না জেনে না বুঝে নয়। যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে (যেমন ইসলাম নির্দেশিত আক্বীদা ও আমল) সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে-বুঝতে হবে; যাদের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাদের হাল-অবস্থা (যেমন ধর্ম, মন-মানসিকতা, সামাজিকতা ইত্যাদি) ভালোভাবে জানতে-বুঝতে হবে এবং দাওয়াত দানের পদ্ধতি, কৌশল ও রীতি সম্পর্কে জানতে-বুঝতে হবে। এই তিনটি জানা-বুঝা দাওয়াতী ক্ষেত্রে একান্তই যরূরী। তারা যে বিষয়ের দাওয়াত দিবে তা জানবে ও বুঝবে, যাদের দাওয়াত দিবে তাদের অবস্থা জানবে ও বুঝবে এবং দাওয়াতদানের পদ্ধতি জানবে ও বুঝবে। যখন এই তিনটি কাজ পূর্ণতা পাবে তখন সে দাওয়াত হবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াত। যদি এর একটাতেও ঘাটতি থাকে তাহ'লে এ তিনটি বিষয় পূর্ণতা পেতে ততটুকুই ঘাটতি তৈরি হবে।

ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর সাথে দাওয়াত-তাবলীগের আবশ্যকতা :

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জেনে-বুঝে দাওয়াত দানের কথা বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করবে তার শুধু বিশেষ কিছু ইবাদত যেমন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, মাতা-পিতার খেদমত, আত্মীয়তার হক আদায় ইত্যাদি পালন করলেই হবে না; বরং তাকে জেনে-বুঝে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতদাতা হ'তে হবে। দাওয়াতের অবস্থা, দাওয়াতের কথা তাকে জানতে হবে।

* ঝিনাইদহ।

যাদের দাওয়াত দিবে তাদের অবস্থা জানতে-বুঝতে হবে এবং দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

দাওয়াতদানের কৌশল :

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন, 'তুমি শীঘ্রই আহলে কিতাবদের একটি কওমের মাঝে যাবে'।[১] তারপর তিনি আহলে কিতাবদের কীরূপ অবস্থা তা তাঁর সামনে তুলে ধরেন, যাতে তিনি সে মোতাবেক তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং প্রত্যেকটা লোককে তার মর্যাদা অনুসারে স্থান দিতে পারেন। সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি মানুষই বিবেক সম্পন্ন। সে জানে, অজ্ঞ জাহেল মানুষকে দাওয়াত প্রদান আর একগুঁয়ে অহঙ্কারীকে দাওয়াত প্রদানের মাঝে তফাৎ কী। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، 'তোমরা উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত গ্রন্থধারী আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম-সীমালঙ্ঘনকারী তাদের বিষয় আলাদা' *(আন'কাবূত ২৯/৪৬)*। সুতরাং যারা যালিম তাদের সাথে আমরা উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে যাব না, বরং তাদের অবস্থান ও যুলূম অনুসারে আমরা তাদের সাথে বিতর্ক করব।

দাঈকে অবশ্যই বিজ্ঞ হ'তে হবে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে এবং কিভাবে লোকদের দাওয়াত দিতে হবে সে সম্পর্কে। আসলে দাঈরা কিভাবে লোকদের দাওয়াত দিবে তা জানা তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা বর্তমানে যে ধর্ম ও মতের উপর আছে তা বদলাতে তারা কি তাদের উপর বল ও চাপ প্রয়োগ এবং রূঢ় আচরণ করবে, নাকি বিনয়-নম্র বচনে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে কাম্য বিষয়ে তাদের দাওয়াত দিবে? তাদের জীবন বিধান ও জীবন যাপন পদ্ধতি নিয়ে যাচ্ছেতাই গালাগালি করবে, নাকি তার কোন বদনাম না করে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিবে? আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি, মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই শুধু নয়, বরং তার সকল বান্দাকে, সকল মুমিনকে কী বলছেন, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، '(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা তাদের গালি দিয়োনা যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে আহ্বান করে। তাহ'লে ওরা অজ্ঞতাবশে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে গালি দিবে' *(আন'আম ৬/১০৮)*।

আমরা সবাই জানি, মুশরিক-মূর্তিপূজারীদের পূজ্য দেব-দেবীকে গালি দেওয়া একটি প্রত্যাশিত বিষয়। কেননা এসব দেব-দেবী বাতিল উপাস্য। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ 'এটা এ কারণেও যে, কেবলমাত্র আল্লাহই সত্য এবং তিনি ব্যতীত যাকে তারা ডাকে সবই মিথ্যা' *(হজ্জ ২২/৬২)*।

বাতিলকে গালি দেওয়া এবং মানুষের সামনে বাতিলের অবস্থান তুলে ধরা একটি কাম্য বিষয়, যা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তা করতে গেলে যখন বড় রকমের ক্ষতি দেখা দিবে, অথচ এই ক্ষতি এড়িয়েও বাতিল দূর করা সম্ভব তখন সেদিক লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত-উপাসনা করে তোমরা তাদের গালি দিও না। নচেৎ ওরা শত্রুতা বশত কোন জ্ঞান-গরিমা ছাড়াই আল্লাহকে গালি দিবে'। এ কথা বিদিত যে, ওরা যখন আল্লাহকে গালি দিবে তখন সে গালি একান্তই শত্রুতা বশত নাহকভাবে দিবে। অথচ আমরা জানি, মহান আল্লাহ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। অপরদিকে আমরা যদি তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে গালি দিতাম তবে তা হ'ত একান্তই হক ও ন্যায়সঙ্গত। তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তা'আলা এই বিদ্বেষপূর্ণ অন্যায় গালি তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কায় ঐ হক কাজ করতেই নিষেধ করলেন। কেননা যে কোন পক্ষ থেকেই হোক, আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেওয়া একটি জঘন্য অন্যায় কাজ।

এ সূত্র ধরেই একজন দাঈ তার দৃষ্টিতে যখন কাউকে কোন বাতিল ধর্মের কিংবা মতের উপর পাবে কিন্তু ঐ লোক তা হক বলে ধারণা করে সেক্ষেত্রে ঐ দাঈ তার ধর্ম ও মতের নিন্দা-মন্দ গেয়ে তাকে হক দ্বীন তথা ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করবেন না। এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেখানো দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। এতে ঐ লোকটি দাঈর প্রতি বিতৃষ্ণাপরায়ণ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে। এমনকি ঐ লোকটি দাঈ যে হক দ্বীনের উপর আছে তা নিয়ে কটূক্তি ও গালাগালিও করতে পারে। কেননা দাঈ তো তার ধর্মকে গালমন্দ করেছে, যাকে সে হক জানে।

দাঈর কর্তব্য ও বোঝাপড়া :

এখানে দাঈ হিসাবে আমার পদ্ধতি হবে যে, আমি তার সামনে হক দ্বীন ও তার সত্যতা তুলে ধরব। হক দ্বীন কিভাবে হ'ল তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব। কারণ অনেক মানুষের সামনেই সত্য ধর্মের আলো অনুদঘাটিত থেকে যায়। বিশেষ করে যারা কোন দল ও মতের অন্ধ অনুসারী। খেয়াল-খুশির তাড়না ও অন্ধ পরানুকরণ হেতু তারা হক ও সত্য ধর্মের দেখা পায় না। এজন্যই আমি বলছি, তার সামনে সত্য ধর্মের বর্ণনা করতে হবে, সত্য ধর্মকে স্পষ্ট করতে হবে। নির্মল নিষ্কলুষ স্বভাব সত্য ধর্ম গ্রহণে অবশ্যই আগুয়ান হবে। কারণ সত্য ধর্ম আল্লাহ্র দ্বীন এবং তার শরী'আত। সুতরাং এ সত্য অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। প্রভাব ফেলবে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর। আমি বলছি না যে, এ প্রভাব হবে তাৎক্ষণিক। কেননা এটা সময় বিশেষে জটিল রূপ নেয়। কিন্তু সময়ক্ষেপণ হ'লেও প্রভাব পড়বেই। কখনো কখনো দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে যে বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে বার বার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। এভাবে তার সামনে হক স্পষ্ট রূপে ধরা দেয়। সুতরাং দাঈ যে বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন সে

১. *মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হা/১৯।*

বিষয়ে ভালোভাবে জানাশোনা থাকা এবং যে পদ্ধতি মেনে দাওয়াতী কাজ করবেন সে সম্পর্কেও উত্তমরূপে জানাবোঝা থাকা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করবে কি করবে না সে ক্ষেত্রে দাওয়াতদাতার আচরণের বিশেষ ভূমিকা আছে। নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখুন, তিনি আল্লাহ্র পথে সর্বোত্তম উপায়ে কিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন। আমরা মরুচারী সেই বেদুইনের কথা খুব ভালো করে জানি, যে মসজিদের এক কোণে গিয়ে পেশাব করছিল। ছাহাবীগণ তা দেখে তার প্রতি চিল্লিয়ে ওঠেন এবং পেশাব করতে নিষেধ করতে থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে পেশাব করতে দাও, বাধা দিও না'।[২]

লোকটার পেশাব ফেরা শেষ হ'লে রাসূল (ছাঃ) নাপাকী দূর করার জন্য ঐ পেশাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দিতে আদেশ দিলেন। তারপর তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, দেখ, মসজিদে পেশাব করা, নোংরা করা সমীচীন নয়। মসজিদ কেবলই আল্লাহ্র যিকির, ছালাত আদায় এবং কুরআন অধ্যয়নের জন্য'।[৩]

পাঠক! ন্যায়ের পথে দাওয়াতের এ রীতি ও পদ্ধতি একটু চিন্তা করুন। এভাবে কোমল ও শান্ত মেজাযে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের মর্যাদা বজায় রাখতে বেদুইন লোকটাকে যে আহ্বান জানালেন তাতে আপনি এ কথা না ভেবে পারবেন না যে, ঐ বেদুইন অবশ্যই তাঁর কথা মান্য করবে, তৃপ্তি বোধ করবে, আরাম পাবে এবং ছাহাবায়ে কেরামের উত্তেজিত হয়ে ওঠা এবং আল্লাহ্র রাসূলের শান্তভাবে শিক্ষাদানের মধ্যে তফাৎটা ধরতে পারবে, যে শিক্ষায় মন উদার হয়, হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

দাঈর আমল-আখলাক :

দাঈ অবশ্যই প্রথমে নিজের দেহে ও আখলাকে সেই হকের প্রতিফলন ঘটাবেন, যার প্রতি তিনি লোকদের দাওয়াত দিবেন। কেননা যে হকের দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন, তিনি নিজেই যদি তার বিরোধিতা করেন তবে তার থেকে চূড়ান্ত আহম্মকি আর কিছু হ'তে পারে না। আর যদি তিনি কোন ভ্রান্ত ও মন্দ বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেন তবে মানুষকে ভ্রান্ত ও মন্দ বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেওয়া তো আরও জঘন্য ঘৃণ্য। অতএব দাঈর চাল-চলন যখন তার দাওয়াতের বিপরীত হবে তখন সে দাওয়াত যে লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ অন্য সকলকে যে দৃষ্টিতে দেখে দাঈদের তার থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। যখন তারা দেখে, দাঈ যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছেন, তিনি নিজেই তা পালন করছেন না তখন তাদের মনে দাওয়াতী বিষয়ে সন্দেহ জাগবে, তা হক, না বাতিল? দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকেরা বলবে, দাওয়াতী বিষয় হক হ'লে তিনি কেন করছেন না। এভাবে জনগণের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। একই সাথে লোকেদের দাওয়াত দিয়ে দাওয়াতী বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখার দরুন সে পাপীও হবে। বনী ইসরাঈলের ইহুদীরা এমন আচরণ করেছিল বিধায় আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কাজকে নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ، 'তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আল্লাহ্র কিতাব (তাওরাত) পাঠ করে থাকো। তোমরা কি বুঝ না?' *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*।

একজন মানুষ অন্যদের সৎকাজের আদেশ দিবে আর নিজে সে সৎকাজ করবে না, তা কখনো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হ'তে পারে না। দাওয়াতী কাজ যদি সত্যিই ভাল হয় তাহ'লে তো প্রথমেই দাওয়াতদাতা তা কার্যকর করবেন এবং তিনি তা আমলে নিবেন। এতে করে তিনি কথায় ও কাজে মানুষের দাওয়াতদাতা হবেন।

দাঈকে যা জানতে হবে :

দাওয়াতদাতার জন্য স্বীয় দাওয়াতী বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানা-বুঝা ও ওয়াকিফহাল থাকা যরূরী। তিনি যেটাকে হক বলে জানেন, কিংবা তার জোর ধারণা আছে যে, এটি হক ও সত্য তিনি কেবল সে বিষয়েই দাওয়াত দিবেন। জোর ধারণাও কেবল সেক্ষেত্রে সিদ্ধ যেখানে ধারণা করার অবকাশ আছে। যে বিষয় তিনি জানেন না সে সম্পর্কে দাওয়াত দিলে তাতে গড়ার থেকে ভাঙাই বরং বেশী হবে। একই সাথে তিনি বড় গুনাহেরও ভাগী হবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*। তুমি এমন কিছুর পিছু নিয়ো না যার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। কারণ তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ আরও বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ، 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বল না, যে বিষয়ে তোমরা কিছু জান না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

না জেনে-বুঝে দাওয়াতদানের পরিণাম :

আমরা কিছু দাঈকে দেখি, যারা তাদের দাওয়াতী বিষয়ে সঠিক অবস্থান থেকে অনেক দূরে। তারা যে জেনে-শুনে এবং স্বেচ্ছায় এ দাওয়াত দিচ্ছেন না, বরং অজ্ঞতাবশে দিচ্ছেন তা

২. *বুখারী হা/৬২০৫, কিতাবুল আদব।*
৩. *মুসলিম হা/২৮৫, তাহারাত অধ্যায়।*

আমাদের জানা অথবা এ বিষয়ে আমরা জোর ধারণা পোষণ করি। এতে দু'টি বড় রকমের ক্ষতি দেখা দিচ্ছে।

প্রথম ক্ষতি : দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দাঈর বাতিল দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া।

দ্বিতীয় ক্ষতি : দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হক রদ হয়ে যাওয়া।

যেমন- আমরা কিছু লোককে দেখি ও শুনি 'তারা এমন অনেক জিনিস হারাম বলে থাকে, যার সপক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। অনুরূপভাবে তারা এমন অনেক জিনিস ফরয বলে থাকে যার সপক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। লোকেরা এ ধরনের দাঈদের প্রতি সুধারণা রাখে। ফলে তারা অন্যদের বর্ণিত হক কথা প্রত্যাখ্যান করে এদের বাতিল কথা মেনে নেয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কোন কোন দাঈকে বলতে শুনেছি, 'রেকর্ডিং যন্ত্রের ব্যবহার জায়েয নেই'। যদি বলা হয় কেন? উত্তরে তারা বলে, 'এ যন্ত্র নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না'। এটা কি কোন দলীল হ'ল? এ কথা দ্বারা দলীল দেওয়ার কোন ছূরত আছে কি?

প্রত্যুত্তরে বলব, এ কথা দ্বারা দলীল দেওয়ার কোনই ছূরাত নেই। কেননা রেকর্ডিং যন্ত্র ইবাদতগত কোন বিষয় নয়। ইবাদতের বিষয় হ'লে আমরা হয়তো বলতাম, এটার পক্ষে শারঈ কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং এটি প্রত্যাখ্যাত। বরং রেকর্ডিং যন্ত্র তো মূল সূত্র অনুসারে মুবাহ মাধ্যমের আওতাভুক্ত। মূলনীতি অনুসারে ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া সকল বস্তুই মুবাহ বলে বিবেচিত, যতক্ষণ না তার বিপক্ষে কোন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে।

ইবাদত ব্যতীত সকল কিছুই মূলতঃ হালাল। তবে এসব বস্তু ব্যবহার গুণে হালাল-হারাম হ'তে পারে। যদি তা বিধিসম্মত কাজের সহায়ক হয়, তবে তা হবে হালাল। আর যদি কোন অবৈধ কাজের সহায়ক হয় তবে তা হবে হারাম। তাই যে রেকর্ডিং যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তাতে যদি ভালো কথা রেকর্ড করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা হবে উত্তম। আর যদি মন্দ কথা রেকর্ড করা হয়, তবে তা হবে নিকৃষ্ট কিছু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম কুরআন লিখিতভাবে রেকর্ড রাখতেন। এই লেখালেখি একটি মাধ্যম। বর্তমান যুগে আমরা লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করি, আবার শব্দ রেকর্ড করার মাধ্যমেও সংরক্ষণ করি। এই শব্দ রেকর্ডিং আমাদের উপর আল্লাহ্র এক বড় অনুগ্রহ বলেই আমি বিবেচনা করি। কত বিদ্যা যে এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে! আর কত শ্রোতা যে তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে! একজন দাঈ সেক্ষেত্রে কিভাবে বলতে পারেন যে, রেকর্ডিং যন্ত্র একটি অবৈধ ও বিদ'আত জিনিস? কিভাবেই তিনি বলতে পারেন, এটাতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না? যদি আমরা তার পথ ও মতে চলি তবে আমরা এমন অনেক কিছুই বাতিলের খাতায় জমা করব যাতে স্পষ্টতই মুসলিমদের কল্যাণ রয়েছে। এ রকম উদাহরণ প্রচুর। আমি বিষয়টা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তবে আমি এ কথায় জোর দিতে চাচ্ছি যে, দাঈকে অবশ্যই আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে ভালো জ্ঞানী হ'তে হবে। যাতে তিনি নিজের অজান্তে নিষিদ্ধ বিষয়ের দাওয়াত না দিয়ে বসেন, কিংবা অজ্ঞতাবশত বৈধ বিষয় পালন করতে নিষেধ না করেন।

হে দাঈ! আপনি আজ যে বিষয়ে না জেনে না বুঝে দাওয়াত দিচ্ছেন তা যদি মুলতবী রেখে আগামীকাল দলীল-প্রমাণ জেনে-বুঝে সে দাওয়াত দেন তবে তা অনেক ভালো হবে। দাঈর জন্য তার দাওয়াতী বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন, যাদের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাদের হাল-হাকীকত জানা এবং দাওয়াত দানের কৌশলাদি রপ্ত করা নিতান্তই সাধারণ কথা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

দাওয়াতের পথে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা :

দাঈর জন্য দাওয়াতের পথে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু থাকা ফরয। এ পথে তিনি কথায় ও কাজে পীড়নের শিকার হ'তে পারেন, তাকে দৈহিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার ও কষ্ট দেওয়া হ'তে পারে, তিনি আর্থিক ও বৈষয়িক ক্ষতিতে পড়তে পারেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই অটল-অবিচল থাকবেন। সাধারণত দেখা যায়, কল্যাণের পথে দাওয়াতদাতার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে যায়। তার দাওয়াতী কাজকে তারা ঘৃণা ও অপসন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا، 'এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু নির্ধারণ করেছি। আর তোমার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমার পালনকর্তাই যথেষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৩১)*।

প্রত্যেক নবীর জন্যই কোন না কোন পাপাচারী শত্রু ছিল। এ শত্রুতা তাঁদের ব্যক্তিগত কারণে নয়, বরং নবুঅতের কারণে। এজন্যেই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে নবুঅত ও রিসালাত লাভের আগে কুরাইশদের মাঝে ছাদিক (সত্যবাদী) ও আল-আমীন (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত ছিলেন, সেখানে নবুঅত লাভের পর তিনি তাদের কাছে হয়ে উঠলেন মহামিথ্যুক, যাদুকর, কবি, গণক, পাগল ইত্যাদি নানা কুৎসিত অভিধায় আখ্যায়িত একজন নিন্দিত মানুষ। আল্লাহ বলেন, 'এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু নির্ধারণ করেছি' *(ফুরক্বান ২৫/৩১)*।

কেন এ শত্রুতা? এ কি তাঁর ব্যক্তিসত্তার কারণে, নাকি নবুঅতের কারণে? বরং নবুঅতেরই কারণে। সুতরাং যে-ই নবীর পথ ও কার্যক্রম ধরে চলবে পাপাচারীদের মধ্য থেকে তার শত্রু হ'তেই হবে। আর যখন কেউ তার শত্রু হবে তখন সে কথায়-কাজে সাধ্যমতো তাকে কষ্ট দিতে কোন ত্রুটি করবে না। দাঈকে এক্ষেত্রে ছবর করতে হবে, ছওয়াবের আশা রাখতে হবে, আল্লাহ্র সাহায্যের প্রত্যাশা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে প্রশংসনীয় পরিণাম কামনা করতে হবে।

ব্যক্তিস্বার্থে নয় বরং আল্লাহ্র জন্য দাওয়াত : ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য দাওয়াত দেওয়া দাঈর জন্য

সমীচীন হবে না, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্র খাতিরে আল্লাহ্র পথে আসার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। তিনি দাওয়াতের কাজে বিজয় লাভ করছেন কি-না, তার প্রদত্ত দাওয়াত তার জীবদ্দশায় জনসমাজে গৃহীত হচ্ছে কি-না এসব নিয়ে তিনি মোটেও চিন্তান্বিত হবেন না। বরং তিনি যে হকের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। চাই তা তার জীবদ্দশায় হোক, কিংবা তার মৃত্যুর পরে হোক। এটা ঠিক যে, মানুষ তার প্রচারিত সত্যকে নিজের জীবদ্দশায় বিজয়ী হ'তে দেখলে খুশি হয় এবং তৃপ্তিবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্র পরিকল্পনা ভিন্ন রকম হ'তে পারে। এ পথে তার কতটুকু ধৈর্য আছে কিংবা নাই তা তিনি পরীক্ষা করতে পারেন। তাৎক্ষণিক ও জীবদ্দশায় তার প্রচারিত সত্য জনমনে গৃহীত না হওয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে পারেন। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং যে সত্যকে তিনি হক বলে জানেন তার উপর অটল থাকতে বদ্ধপরিকর থাকতে হবে এবং শেষ পরিণাম যে তার পক্ষে যাবে সেই ইয়াকীন পোষণ করতে হবে।

দ্বীনের সত্যতা নিয়ে দাঈ সন্দেহে পতিত হবেন না : কিছু দাঈকে দেখা যায়, তারা যখন এমন কোন কথা শুনতে পান, যা তাদের কষ্ট দেয় অথবা তাদেরকে জড়িয়ে এমন কোন কাজ সংঘটিত হ'তে দেখেন, যা তাদের পীড়া দেয় তখন তারা ঘাবড়িয়ে যান, দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হন কিংবা তাদের লালিত আদর্শ হক কি-না তা নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়ে পড়েন। এমন দাঈরা মূলতঃ ব্যর্থ।

আল্লাহ তা'আলা তো তার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এমন সন্দেহ হ'তে কড়াভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ، 'অতঃপর যদি তুমি সন্দেহে পতিত হও যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, তাহ'লে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্বেকার কিতাব পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে এসে গেছে সত্য কিতাব। অতএব তুমি কখনোই সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(ইউনুস ১০/৯৪)*।

দাঈ তার দাওয়াতকে জনগণ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে দেখতে না পেলে অনেক সময় হতাশ হয়ে দাওয়াতের কাজ থেকে সরে দাঁড়ান। তার মনে প্রশ্ন দোলা দিতে থাকে, তিনি কি সত্যের উপর আছেন, না কি নাই? কিন্তু সত্য তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা যা হক, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন, হকের একটি সুবিদিত বাতিঘর করে দিয়েছেন।

সুতরাং হে দাঈ, আপনি যখন জানবেন যে, আপনি হকের উপর আছেন তখন তাতে দৃঢ় ও অবিচল থাকুন। আপনার কানে কটূ ও অপসন্দনীয় যত কথাই এসে বাজুক, আর চোখের সামনে অসহনীয় যত দৃশ্যই দেখা দিক, আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন। শেষ হাসি মুত্তাক্বীদের জন্যই।

দাওয়াতী কাজে দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা : দাওয়াতী কাজে দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা করা দাওয়াতের একটি আবশ্যিক আদব। কোন দাঈ যেন 'একলা চলো' নীতি অবলম্বন না করেন। শুধু তার কথাই লোকেরা মানবে, তার কথাই সবার আগে থাকবে, এমন চিন্তা যেন তাকে পেয়ে না বসে। বরং দাওয়াত কবুল হওয়াই হবে দাঈদের একমাত্র ফিকির। চাই সে দাওয়াত তিনি দিন অথবা অন্যে দিক। হে দাঈ ভাই। আল্লাহ্র বাণী বুলন্দ করার চিন্তা যতক্ষণ আপনার চেতনা জুড়ে থাকবে ততক্ষণ সে বাণী আপনার পক্ষ থেকে বুলন্দ হ'ল না অন্যের পক্ষ থেকে বুলন্দ হ'ল তা নিয়ে আপনার বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। এটা ঠিক যে, মানুষ তার হাত দিয়ে কল্যাণ সাধনকে ভালোবাসে। কিন্তু অন্যের হাত দিয়ে কল্যাণ হওয়াকে অপসন্দ করা তার জন্যে উচিত নয়। বরং তার জন্য আল্লাহ্র দ্বীন সমুন্নত হওয়াই বড় কথা। কার হাত দিয়ে তা সমুন্নত হ'ল তা বড় কথা নয়। দাঈ তার দাওয়াতী কাজ যখন আমাদের এ কথার ভিত্তিতে করবেন তখন তিনি আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানে অন্য দাঈদের সাহায্যে অচিরেই এগিয়ে আসবেন। তাতে লোকেরা তার দাওয়াত গ্রহণের আগে অন্যদের দাওয়াত কবুল করলেও তিনি নাখোশ হবেন না।

দাঈগণ সবাই মিলে এক জোট হবেন। তারা একে অপরকে সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন, পরস্পরে সলা-পরামর্শ করবেন। সবাই এক পথের পথিক হবেন। আল্লাহ্র পথে দু'জন দু'জন, তিন জন তিন জন এবং চার জন চার জন করে দাঁড়িয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى، 'তুমি বল, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্র জন্য দু'দু'জন বা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও' *(সাবা ৩৪/৪৬)*।

আমরা তো দেখি অকল্যাণ ও খারাপ পথের দাওয়াতদাতারা সবাই একাট্টা, একজোট ও একমত। সেখানে আল্লাহ্র পথের দাঈরা কেন ঐক্যের এ আমলে আগুয়ান হবেন না? দাওয়াতের পথে কে কোথায় বিদ্যা-বুদ্ধিতে ভুল করছেন, দাওয়াতের পদ্ধতিতে ত্রুটি করছেন, কেন তারা ভালোবেসে একে অপরকে বলবেন না? আমরা যখন কুরআন ও সুন্নাহর বাণীর দিকে তাকাই তখন আমরা তো দেখি আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের এমন সব গুণ তুলে ধরেছেন যাতে প্রতীয়মান হয়, তারা একতাবদ্ধ এবং একে অপরকে সাহায্যকারী। তিনি বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ، 'আর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবা ৯/৭১)*।

তিনি আরও বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা আবশ্যক, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৪-১০৫)*।

সহযোগিতা না করে উল্টো দাঈদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের কুফল : শয়তান চায়- একজন দাঈ তার মত আরেকজন দাঈকে দাওয়াতের ময়দানে সফল হ'তে দেখে হিংসাকাতর হোক। হিংসাপরায়ণ দাঈ তার মত দাওয়াতে সফল হ'তে আগ্রহী নন, বরং ঐ দাঈ যে তার থেকে এগিয়ে গেল এবং লোকেরা তার দাওয়াতে সাড়া দিল এটাই তার হিংসার কারণ। এ কারণে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) হিংসার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ তোমার উপর না হয়ে অন্যের উপর হওয়ায় তুমি যে অসন্তুষ্ট হ'লে তারই নাম হিংসা। যদিও জ্ঞানীদের মাঝে প্রসিদ্ধি আছে যে, অন্যের প্রাপ্ত অনুগ্রহ তার থেকে অপসৃত হোক, মনে-প্রাণে এমন কামনা-বাসনা পোষণের নাম হিংসা। তাই আমরা বলি, 'তোমাকে বাদ দিয়ে অন্যের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ করাতেই তুমি নাখোশ হচ্ছ, তোমার এহেন মানসিকতার নামই হিংসা; চাই তুমি সে অনুগ্রহের ক্ষয়-লয় কামনা কর কিংবা না কর'।

সুতরাং হে মানুষ! তোমার দাঈ ভাইকে তার দাওয়াতী কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য। এমনকি সেই দাওয়াতদাতা ভাই দাওয়াতী লাইনে তোমার থেকে এগিয়ে থাকলেও এবং তাতে অপেক্ষাকৃত বেশী সফল হ'লেও তুমি তার সহযোগিতা করতে পিছপা হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ্র এ যমীনে আল্লাহ্র বাণী সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান লাভ তোমার চাওয়া-পাওয়া হবে।

আমার ভাইয়েরা, যারা মন্দ ও খারাপ কাজের দাওয়াত দেয় ওরা তো ভালো ও কল্যাণমুখী কাজের দাঈদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিভেদই চায়। ওরা জানে, মঙ্গল পথের দাঈদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা তাদের জন্য সফলতা বয়ে আনবে। পক্ষান্তরে অনৈক্য ও অসহযোগিতা তাদের ব্যর্থতা ও অসফলতা নিশ্চিত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা শক্তিহীন হবে ও তোমাদের প্রতিপত্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

সন্দেহ নেই যে, আমাদের প্রত্যেকেই ভুল-ভ্রান্তির আওতাভুক্ত। সুতরাং আমরা যখন আমাদের কারও থেকে ভুল কোন কিছু হ'তে দেখব তখন আমাদের কর্তব্য হবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভুল শুধরিয়ে দেওয়া, কোথায় কিভাবে ভুল হচ্ছে তা বুঝিয়ে দেওয়া। অনেক সময় এমনও হ'তে পারে যে, আমাদের ধারণায় কাজটা ভুল, কিন্তু বাস্তবে তা ভুল নয়। তখন সেই ভাইটাই আমাদের ধারণায় যে ভুল হয়েছে তা বুঝিয়ে দিবেন। কারও ভুলের দরুন তাকে নিন্দা-মন্দ করা, তার প্রতি ঘৃণা ছড়ান যেখানে কোন মুমিনের জন্যই শোভনীয় হ'তে পারে না সেখানে আল্লাহ্র পথের একজন দাঈর জন্য তো তা মোটেও সমীচীন হ'তে পারে না।

কিছু দাঈর ভুল মানসিকতা : এদিকে নিকট অতীতে বেশ কিছু বছর ধরে অনেক যুবক আল্লাহ্র পথে দাওয়াতী কাজে সঠিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন, ফালিল্লাহিল হাম্দ। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গলতিও হচ্ছে। কোন কোন যুবককে দেখা যাচ্ছে, তিনি এককভাবে চলছেন। তিনি অন্যদের মতামতের কোন তোয়াক্কা করছেন না। নিজের জ্ঞান-গরিমা ও চিন্তা-ভাবনার উপর তিনি খুবই আত্মতুষ্ট। যদিও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতা এবং চিন্তার মধ্যে ভুলের পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। তথাপি তিনি অন্যদের তুচ্ছ ভাবতে কম করেন না। তাদের কাছে যে হক আছে সেদিকে একটু ফিরেও দেখেন না। এমনকি তার সামনে যদি মুসলিম সমাজের এমন কোন গণ্যমান্য ইমামের নাম উচ্চারণ করা হয় যাঁর জ্ঞান-গরিমা, ধার্মিকতা ও আমানতদারী সর্বজন স্বীকৃত তখন তিনি বলেন, ইনি আবার কে? ইনিও পুরুষ আমিও পুরুষ। অথচ তার পৌরুষ যে স্বল্প জানাবুঝা ও স্বল্প বিদ্যাভিত্তিক তাও সত্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি কোন একটা বিষয়ের নানাদিকের দলীল-প্রমাণ একত্র করে ঘাঁটাঘাঁটি না করে বরং তার পসন্দমতো একটা দলীল নেন এবং তার ভিত্তিতে নিজের মত প্রকাশ করতে থাকেন। বিশেষ করে যদি সে দলীল দ্বারা বিরল কোন বিধান সাব্যস্ত হয় তাহ'লে তিনি তা স্বাচ্ছন্দ্যে লুফে নেন এবং অন্য সব দলীল পাশ কাটিয়ে যান। সঠিক দলীলের দিকে ফিরে আসার কোনই গরজবোধ করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন তাকে বলা হয়, ভাই, আপনার গৃহীত মত পুনর্বিবেচনা করুন; এতদসংক্রান্ত সকল দলীল-প্রমাণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতামত যে আপনার মতের বিরুদ্ধে তাও খেয়াল করুন, তখন তিনি এ কথায় একটুও কর্ণপাত করেন না। অধিকন্তু দাওয়াতের ময়দানে কর্মরত অন্যান্য কর্মী ভাইয়েরা যখন তার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করেন তখন তিনি তাদের মতকে বাতিল এবং নিজের মতকে হক দাবী করতে থাকেন, যেন তার কাছে এ সম্পর্কে অহী এসেছে।

সন্দেহ নেই যে, দাওয়াতের এ মানহাজ বা পদ্ধতি সঠিক

নয়। ইজতিহাদী বা গবেষণাযোগ্য বিষয়ে 'আমিই সঠিক এবং অন্যেরা ভুলের উপর আছে' এমন বিশ্বাস পোষণ করা কারো জন্যই বৈধ নয়। এমন আক্বীদা পোষণ করলে দাঈ নিজেকে যেন নবুঅত ও রিসালাতের পদাধিকারী গণ্য করছেন, যিনি নিষ্পাপ। অথচ তা কখনই হ'তে পারে না। সুতরাং হে যুবক! ভুল যেমন আপনার বাদে অন্যের হ'তে পারে তেমনি আপনারও হ'তে পারে। আর যে নির্ভুলতার দাবী আপনি নিজের জন্য করছেন, অন্যেও তা দাবী করতে পারে। এমনও হ'তে পারে যে, আপনার বিপক্ষে যিনি আছেন তিনিই সঠিক এবং আপনি আছেন ভুলের উপর।

কিন্তু দাওয়াতের এহেন ভুল পদ্ধতিতে কাজ করতে দেখা যায় অনেক যুবককে। তারা একটা গ্রুপের সাথে ভিড়ে যায় কিংবা নির্দিষ্ট কোন আলেমের অনুসারী সাজে। তাকেই সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তার কথাই শিরোধার্য করে নেয়, চাই তা ভুল হোক কিংবা ঠিক হোক। বাস্তবে এমন ধারার কাজকর্ম ও আচরণ উম্মতের মধ্যে বিভেদ ডেকে আনছে এবং উম্মতের শক্তি-সাহস দুর্বল করে দিচ্ছে। আল্লাহ্র পথে আগমনকারী এসব যুবক পরিণামে মন্দ ও খারাপ পথের পথিকদের ঠাট্টা-তামাশার পাত্রে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের করণীয় : এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হবে আল্লাহ যেরূপ আদেশ করেছেন তেমনটা হওয়া। আমরা বরং ঠিক তেমন গুণাবলীর অধিকারী হব যেমনটা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً 'এরা সবাই তোমাদের একই উম্মতভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৯২)*। আমাদের কথা হবে এক। আমি বলছি না যে, আমাদের কথা এক হওয়া মানে যেখানে মতভেদের অবকাশ আছে সেখানেও আমাদের মতান্তর হবে না। এমনটা হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, যেখানে মতভেদের অবকাশ আছে সেখানকার মতান্তর যেন আমাদের মনান্তরে রূপ না নেয়। বরং আমাদের অন্তরগুলো একতাবদ্ধ থাকবে, আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব বজায় থাকবে এবং পরস্পরে মিল মহব্বত অটুট থাকবে, ইজতিহাদী বিষয়ে আমরা যতই মতানৈক্য করি না কেন।

এখানে উদাহরণ হিসাবে একটা মাসআলা তুলে ধরা যাক। মাসআলাটি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তুলনায় অনেকটাই লঘু। আপনারা অনেকেই জানেন, ছালাতের প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়ানোর মুহূর্তে বসার একটি বিষয় রয়েছে। কিছু আলেম মনে করেন এ বসা সুন্নাত এবং কিছু আলেম মনে করেন এ বসা সুন্নাত নয়। আবার কিছু আলেম বিষয়টি এড়িয়ে চলেন। এ মত খুবই মশহূর। কিন্তু দাওয়াতের ময়দানে আমার কোন সাথী ও শরীক যদি মনে করেন, এ বসা সুন্নাত এবং আমি মনে করি এ বসা সুন্নাত নয়, আর সে বসে কিন্তু আমি বসি না, তবে কি এই বসা- না বসার মতভেদকে কেন্দ্র করে আমাদের একজনে অন্যজনকে অপসন্দ ও ঘৃণা করা বৈধ হবে? আমরা কি কেউ কাউকে বদনাম ও অপদস্থ করতে পারব? আল্লাহ্র কসম, এমনটা কখনই জায়েয হবে না।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজেদের মধ্যে এর থেকেও অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতানৈক্য করেছেন তারপরও তারা কেউ কাউকে ঘৃণা ও অপসন্দ করেননি। তাহ'লে আমরা কেন দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ছেড়ে এসব সামান্য মাসআলা নিয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষের ছড়াছড়ি করব? আমাদের অনেকেরই এ ঘটনা জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহযাব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে বনু কুরায়যা পল্লীতে যাওয়ার আদেশ করেন। তারা মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল। ফলে তিনি তাঁর ছাহাবীদের বনু কুরায়যা পল্লীতে যাওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন এবং বললেন, কেউ যেন বনু কুরায়যায় না পৌঁছা অবধি আছর ছালাত আদায় না করে। তারা মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে আছর ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে কিছু ছাহাবী বললেন, বনু কুরায়যায় না পৌঁছে আমরা ছালাত আদায় করব না। তারা ছালাত এতটা বিলম্বিত করলেন যে ওয়াক্ত পেরিয়ে গেল। অন্য কিছু ছাহাবী বললেন, আমরা সময়মতই আছর ছালাত পড়ে নেব, বনু কুরায়যায় গিয়ে না হয় ছালাত নাইবা পড়ব।

এ খবর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি দু'দলের কাউকেই ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেননি। ছাহাবীরাও এ নিয়ে কেউ কারও প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করেননি। যদিও প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সিজদা থেকে ওঠার সময় বসা থেকে সময় মতো ছালাত আদায় নিয়ে মতানৈক্য অনেক বেশী কঠিন। সময় পেরিয়ে গেলে ছালাত পড়বে না সময়ের মধ্যে ছালাত পড়বে এ মতানৈক্য বসার মতানৈক্য থেকে বড় জটিল।

সুতরাং দাওয়াতদাতা ভাইদের কাছে আমার প্রত্যাশা, তারা যেন ইজতিহাদের সুযোগ আছে এমন সব বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, দলাদলী এবং পরস্পরকে গুমরাহ আখ্যা না দেন। কেননা এতে করে তাদের শত্রুদের সামনে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে। আপনারা জানেন আমাদের এমন অনেক শত্রু আছে যারা ইসলামের কল্যাণময় পথের দাওয়াতদাতাদের ধ্বংসের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে আছে। তবে যার সঙ্গে আল্লাহ আছেন শুভ পরিণাম তার জন্যই। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্যপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 'নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করব আমাদের রাসূলদের ও মুমিনদের, যেদিন দণ্ডায়মান হবে সাক্ষীগণ' *(মুমিন ৪০/৫১)*।

শেষ প্রার্থনা : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি জেনেবুঝে দাওয়াতদাতা বানান এবং আমাদেরকে তার পক্ষ থেকে রহমত দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা।

হতাশার দোলাচলে ঘেরা জীবন : মুক্তির পথ

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যক্তিগত অপারগতা ও অজ্ঞতা; অপরদিকে সামাজিক অবিচার ও অনাচার- মূলতঃ এ দু'টি কারণ মানুষকে একদিকে যেমন জীবনযুদ্ধে অসহায় ও বিপন্ন করে তোলে, অন্যদিকে সমাজের বিরুদ্ধে করে তোলে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী। আর এখান থেকেই ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হয় হতাশা আর বেদনার এক অবিচ্ছেদ্য মেঘকাব্য। যা কখনও একাকীত্বের বেদনায় মুষড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদে আবার কখনওবা ক্ষোভের বিজলী বর্ষণে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ে। মানুষের এই জীবনগতি প্রায় সবার ক্ষেত্রে একই রকম। তবে মূল পার্থক্য ঘটে বোধের জায়গায় এবং নীতির প্রতি অবিচলতায়। যারা ঈমানদার তারা ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসকে নিত্য সাথী করে সাধ্যমত আদর্শের পথে নিজেকে পরিচালনা করেন। কিন্তু যারা ঈমানহীন তারা প্রায়শই এই যুদ্ধের ময়দানে নিঃশর্ত আত্মসমার্পণ করে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। আর এই দ্বৈরথের মাঝে অতিক্রান্ত হচ্ছে মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবনাচার।

বাংলাদেশ সহ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বস্তুগত উন্নয়নের জোয়ার ক্রমবর্ধমান হ'লেও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হতাশার বিস্তার কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে। কারণ আধুনিক মিডিয়া ও মার্কেটিং-এর সীমাহীন হাইপে মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যাশার জায়গা যেই উত্তুঙ্গ হারে বাড়ছে, প্রাপ্তির জায়গা নিঃসন্দেহে সেই হারে বাড়ছে না। ফলে মানুষ দ্রুতই নিজেকে প্রতিযোগিতার ময়দানে পরাজিত এবং পশ্চাদপদ ভেবে হতোদ্যম হয়ে পড়ছে। একটা সময় হতাশার গ্রাস থেকে তারা আর নিজেকে বের করে আনতে পারছে না। ফলে অধিকাংশ সময় নেতিবাচক সিদ্ধান্তেই সে মুক্তি খুঁজে নিতে চাচ্ছে। কেউ ক্ষণিকের মিথ্যা সুখের জন্য বেছে নিচ্ছে অনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা মাদকের মত নীল দংশন, কেউবা চূড়ান্ত পর্যায়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কিছু আত্মহত্যার ঘটনা সবাইকে নাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ঢাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আবু মুহসিন খান (৫৮)-এর ফেসবুক লাইভে এসে আত্মহত্যা এবং তৎপূর্ববর্তী বক্তব্যসমূহ যথেষ্ট ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে এবং ফুটিয়ে তুলেছে দৃশ্যত চাকচিক্যপূর্ণ বর্তমান সমাজব্যবস্থার ভয়াবহ ফাঁপা দিকগুলো। জনাব আবু মুহসিনের কিছু কথা এতটাই বাস্তব ও রূঢ় সত্য, যা আমাদের সমাজ জেনেশুনেই চেপে রাখছে। যেমন- প্রথমতঃ এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মানুষ একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ দিন দিন ভুলে যাচ্ছে এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। শিথিল হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। মানুষ হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ। সবকিছু থেকেও না থাকার বেদনায় বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে উঠছে তাদের অনেকের কাছেই।

পাশ্চাত্যের প্রচারণায় প্রলুব্ধ সমাজ এখন সন্তান গ্রহণে আগ্রহী নয়। ছেলে হোক, মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট-এই শ্লোগান ছিল বাংলাদেশে আশির দশকের আর বিংশ শতাব্দীর শ্লোগান হ'ল- 'দু'টি সন্তানের বেশী নয়, একটি হ'লে ভালো হয়'। এমনকি ২০১২ সালে এক সন্তান নীতি গ্রহণের জন্যও প্রস্তাব উঠেছিল। এই প্রচারণার সামাজিক ক্ষতি হ'ল মানুষ এখন সন্তান নিতে এমন অনাগ্রহী হয়ে উঠেছে যে, দুইয়ের বেশী সন্তান বর্তমানে খুব কম সংখ্যক পরিবারেই রয়েছে। এই দু'একটি সন্তান আবার যখন বড় হচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনা কিংবা জীবিকার তাকীদে তারা পিতা-মাতা থেকে দূর-দূরান্তে চলে যাচ্ছে। তারপর বছরে হয়তো একবার বা দু'বার ঈদ কিংবা বার্ষিক ছুটিতে তাদের সাথে পিতা-মাতার দেখা হয়। আর যারা বিদেশে চলে যায়, তাদের সাথে এই ব্যবধানটা আরো দীর্ঘ হয়। কখনো কয়েক বছর চলে যায়। আর এভাবে সন্তানের অনুপস্থিতিতে একসময় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়া পিতা-মাতা ভুগতে থাকেন নিঃসঙ্গতায়। একাকিত্বের প্রহরগুলো তাদের জন্য হয়ে ওঠে চরম যন্ত্রণার। ইন্টারনেটের বদৌলতে যোগাযোগব্যবস্থা সহজলভ্য হ'লেও কৃত্রিমতার আবরণ ছেদ করে সেই যোগাযোগ কখনও সন্তানকে পাশে পাওয়ার বিকল্প হয় না। হাজারো মানুষের ভিড়ে প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে তাদের অব্যক্ত হৃদয় সদা ব্যাকুল থাকে।

ফলে বাহ্যতঃ সন্তানরা কে কোন দেশে থাকে বা কোথায় বড় বড় চাকুরী করে, তা নিয়ে পিতা-মাতার গর্বভরা কণ্ঠের আড়ালে যে দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে, তা অদেখাই থেকে যায়। মুখোশের আড়ালে থেকে যায় বেদনার এক অশ্রুঝরা উপাখ্যান। এভাবে আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো যেমন নড়বড়ে হচ্ছে, তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠছে গুরুজনদের নিবিড় স্নেহ-ভালোবাসার পবিত্র বন্ধন থেকে বঞ্চিত এক কুপমণ্ডুক পরিবেশে। এভাবে পাশ্চাত্যের মত আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো শিথিল হ'তে হ'তে বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের ঘেরাটোপে বাধা পড়ছে আমাদের পৌঢ় জীবন।

অর্থ-বিত্তের ঝনঝনানি আর সামাজিক স্ট্যাটাস যে কখনই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না তার বাস্তব উদাহরণ আবু মুহসিন। তার আর্তনাদ- একা থাকা যে কী কষ্ট-যারা একা থাকেন তারাই একমাত্র বলতে পারেন বা বোঝেন। এই আর্তনাদ কেবল আবু মুহসিনের নয়, বরং বর্তমান আধুনিক ও শিক্ষিত সমাজের ঘরে ঘরে কান পাতলে আজ এই আর্তনাদ শোনা যায়। আগামীতে হয়তো আরো শোনা যাবে। যদি না তথাকথিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশংকায় সন্তান গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করার প্রকৃতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা সরে না আসি। আশার কথা যে, চীন, জাপানসহ ইউরোপীয় দেশগুলো ইতিমধ্যে এই নীতির সামাজিক অপকারিতা বুঝতে পেরে পিছু হটেছে এবং জনসংখ্যাকে জনশক্তি হিসাবে

বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমাদের দেশের সরকারেরও কিছুটা বোধোদয় ঘটেছে এবং জনসংখ্যাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে প্রচারের হঠকারিতাও কমিয়ে দিয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্র আইন বিরোধী কোন পদক্ষেপই সমাজে প্রকৃত শান্তি আনতে পারে না। এই বোধ যত জাগ্রত হবে, ততই আমরা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথে ধাবিত হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের অপর এক চিত্র আমরা দেখেছি গত ১০ই ফেব্রুয়ারী'২২ রাজধানীর বাড্ডাতে। এক হতভাগ্য পিতা তার ছোট সন্তানকে প্রায় সব সম্পত্তি লিখে দেয়ার পরও তার হাতে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছেন। এতেই শেষ হয়নি। সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে দুই সন্তানের কাটাকাটিতে পিতার লাশ ২৪ ঘন্টা বাড়ির গ্যারেজে পড়ে থাকার পর পুলিশ এসে দাফনের ব্যবস্থা করে। দ্বীন শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সঠিক চর্চা না থাকায় মানুষ বিশেষ সহায়-সম্পত্তির ব্যাপারে যেন পশুরও অধমে পরিণত হচ্ছে। সামান্য সম্পত্তির লোভে পরিবারগুলোতে জ্বলছে ক্ষোভের আগুন। ভাই-বোনের মধ্যে ভাঙছে সম্পর্ক, দূরত্ব তৈরী হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের, নিত্য কলহ চলছে প্রতিবেশীদের মধ্যে। দ্বীনদারী আর সব জায়গায় থাকলেও সহায়-সম্পত্তির আগ্রাসী লোভ তাদের খেয়ে ফেলছে নেকড়ের মত। হিংস্র পশুর চেয়ে তারা ভয়ংকর হয়ে উঠছে সময়ে সময়ে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানের অপপ্রয়োগও প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। একজন ব্যক্তি যখন একই সাথে কালেমা পাঠ করে, এমনকি ওমরায় পরিহিত ইহরামের কাপড় দিয়ে কাফন দেয়ার জন্য অছিয়ত করে, আবার দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মহননের মত মহাপাপ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে- এখানে তার অভাবটা কিসের? আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস বা ভরসার দুর্বলতা না-কি দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের? মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের জীবনে কঠিন মুহূর্ত আসতেই পারে, কিন্তু ঈমানদারদের জন্য সেটা কাটিয়ে ওঠা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয় যদি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস ও ভরসা থাকে। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে যারা দ্বীন বোঝেন, যাদের জীবনটা আল্লাহ্র সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত, তারা কখনও এমন অবসর খুঁজে পান না যে, একাকিত্বের বেদনায় জীবনটাকে অকেজো করে তুলবেন। বরং এই নিঃসঙ্গ সময়কে তারা আল্লাহ্র ইবাদতে নিবিষ্ট থাকার মোক্ষম উপলক্ষ হিসাবে নেন। দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার এই সুযোগকে বরং তারা সানন্দেই গ্রহণ করেন। যারা মহান প্রভুর সাথে সম্পর্কের এই স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি, একাকী জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হ'তে পারে, কিন্তু একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির জন্য তা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। এতে বোঝা যায়, এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীনের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা রয়েছে, কিন্তু দ্বীন সম্পর্কে ভয়াবহ অজ্ঞতার কারণে অধিকাংশ মানুষ ডুবে আছে কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির অতল তলে।

সর্বোপরি বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্নটি বার বার আমাদের মনে ধাক্কা দিচ্ছে তা হ'ল, হাজারো ইতিবাচক দিক পেছনে ঠেলে অধিকাংশ মানুষ কেন নেতিবাচক সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দেয়? কেন শত প্রাপ্তির মাঝেও নিজের অপ্রাপ্তিগুলোকেই বড় করে দেখে? কেন হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে অবশেষে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার মত চূড়ান্ত পরিকল্পনা পর্যন্ত করে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা কয়েকটি বিষয়কে সামনে আনতে পারি-

(১) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের দুর্বলতা : যে ব্যক্তি তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে না বা আস্থা রাখে না; সে কখনই জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সঠিক পথে পরিচালিত হ'তে পারে না। কেননা সে তার জীবনের মূল ভরকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্বাসে, নিঃশ্বাসে যার যোগ আল্লাহ্র সাথে, সঠিক পথের যাত্রী হওয়ার নছীব কেবল তারই হয় *(আলে ইমরান ৩/১০১)*।

(২) জীবনের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা : মানুষকে আল্লাহ খুব সংক্ষিপ্ত একটি সময় দিয়েছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। একজন পরীক্ষার্থী যেমন তার পরীক্ষার মূল্য বুঝে বলে পরীক্ষার হ'লে ভালো ফলাফলের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে; ঠিক তেমনি এই জীবন পরীক্ষাগারের মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্তকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে পরকালীন সাফল্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। শুরু কিংবা মধ্যটা খারাপ গেলেও শেষটা ভাল করার জন্য যারপরনেই ইচ্ছা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞ সে শিশু, পাগল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মতই উদাসীন থেকে যায়। এই পরীক্ষার হল তার জন্য কেবল সময় পার করার স্থান হয়। জীবনের প্রকৃত মূল্য সে জানে না, অনুধাবনও করতে পারে না। তাই এর বিনাশ সাধনেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না।

(৩) জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে অসচেতনতা : আল্লাহ্র দাসত্বকে যে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে পারেনি, সে নিঃসন্দেহে লক্ষ্যহীন কিংবা ভুল লক্ষ্যপানে ছুটে চলা ব্যক্তি *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। সে আল্লাহ্র দাসত্বের মূল অংক মেলানোর কাজ ভুলে সর্বদা ভুল অংক মেলাতে সচেষ্ট হয়। তারপর কোন অংক না মেলাতে পারলে খুব সহজেই সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

(৪) ধৈর্যের অভাব : পার্থিব জীবন আমাদের পরীক্ষার জীবন। যে কোন সময় যে কোন ধরনের পরীক্ষা আমাদের উপর নেমে আসবে। কখনও সে পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই হাল ছেড়ে দেয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখবে এবং ধৈর্য সহকারে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবে, এটাই ঈমানের দাবী। যারা এই ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করে না, তারা অতি সহজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

(৫) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : আধুনিক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ পৃথক এন্টিটি হিসাবে বসবাস করতে চায়। যে যার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, কেউ কারো ব্যাপারে নাক

গলাবে না- এটাই আধুনিক জগতের মূলনীতি। ফলে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এখানে যরূরী নয়। স্বার্থপরতা, অসামাজিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এই সমাজব্যবস্থার আবশ্যিক অনুষঙ্গ। একে অপরের অতি কাছে থেকেও তারা একেকজন বসবাস করে অবরুদ্ধ জানালা লাগিয়ে। ফলে ফিতরাতবিরোধী এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সহজেই হতাশা ও বিষণ্নতাগ্রস্ত হচ্ছে।

মুক্তির পথ :

এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে চাইলে করণীয় হ'ল-

প্রথমতঃ ইতিবাচক জীবন যাপন করা : মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন ভালো-মন্দ, সহজ-কঠিন, ইতি আর নেতির বিচিত্র সমাহার। জীবনে কখনো ভালো সময় আসবে, কখনও মন্দ সময় আসবে এটাই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। অতএব একজন মুমিন ব্যক্তি সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তার জীবন পরিচালনা করবে। এমনভাবে যে, আনন্দের সময় সে আত্মহারা হবে না, আবার দুঃখের সময় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বে না। জীবনের সকল অবস্থায় শোকর ও ছবরের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখবে। সবকিছুকে যথাসম্ভব ইতিবাচকভাবে নেবে। যেমন ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ে যেন মুসলমানরা অধিক শোকাকুল না হয়, সেজন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্ত্বনা সূচক বক্তব্য, 'তোমাদেরকে যদি আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তো তাদেরও লেগেছে এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলিকে পর্যায়ক্রমে অদল-বদল করে থাকি' *(আলে ইমরান ৩/১৪০)*। ঈমানদারের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। যখন তারা কল্যাণ ও মঙ্গলের মধ্যে থাকে, তখন শোকর গোযার থাকে। আর যখন অসচ্ছলতা কিংবা বিপদাপদে আক্রান্ত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে। ফলে প্রতিটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/৭৩৯০)*।

দ্বিতীয়তঃ হতাশাকে প্রশ্রয় না দেয়া : আমাদের যাপিত জীবনে সুখ-দুঃখের সাথে হতাশার যোগ খুবই ওতপ্রোত। যে কোন অপ্রত্যাশিত কথায় ও কাজে কিংবা অপ্রাপ্তির বেদনায় আমাদের মধ্যে হতাশা আসতেই পারে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মানুষ তা নিজের মধ্যে জিইয়ে রাখতে পারে না। তার চেষ্টা থাকে যে কোন মূল্যে তা দূরীভূত করা কিংবা ভুলে যাওয়া। কেননা আল্লাহ্র বাণী হ'ল- 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া পথভ্রষ্ট লোকদের কাজ' *(হিজর ৫৬)*। কুরআনে অন্যত্র এসেছে, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র করুণা থেকে নিরাশ হয় না *(ইউসুফ ১২/৮৭)*। আল্লাহ বলেন, এই পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের ব্যক্তিজীবনে যে সকল বিপদাপদ আসে, তা ঘটার আগেই আমি তা কিতাবে (তাকদীরে) লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুব সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দে উদ্বেলিত না হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না কোন উদ্ধত-অহংকারীকে *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকাই ঈমানদারের পরিচয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে, আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে' *(মুসলিম হা/৫৭)*।

তৃতীয়তঃ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখা : মানুষের সাথে মিশতে পারা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারা হতাশা ও বিষণ্নতা থেকে বেরিয়ে আসার অন্যতম কার্যকর মহৌষধ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক মানুষ বরাবরই নিজের কষ্টের সময়গুলো মানুষের সাথে ভাগাভাগি করতে না পেরে নিদারুণ মানসিক কষ্টে আপতিত হয়। সুতরাং সমাজের ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকা, সংঘবদ্ধ ও সাংগঠনিক জীবন যাপন করা মানুষের জন্য খুবই যরূরী এবং ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা। একাকী বিচ্ছিন্ন জীবন ইসলামের কাম্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জামা'আতবদ্ধ জীবন রহমত আর বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব *(ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাক। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দু'জন (ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ) মানুষ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*।

চতুর্থতঃ শয়তানী কুমন্ত্রণার ব্যাপারে সতর্ক থাকা : শয়তান মানুষের চূড়ান্ত শত্রু। সে সর্বদা কুমন্ত্রণা যোগায় মানুষকে অন্যায় পথে নেয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন, 'শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*। এজন্য সর্বদা শয়তানের ফেরেব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

পঞ্চমতঃ তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা : আল্লাহ্র উপর ভরসা ও তাক্বদীরে বিশ্বাস যে কোন মানুষের জন্য অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবলের খোরাক। কেননা সে জানে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিশ্বাসী বান্দার একান্ত মঙ্গলের জন্যই তাঁর কর্মপরিকল্পনা। এই বিশ্বাস তাকে কখনও পথ হারাতে দেয় না। আশার প্রদীপ নেভাতে দেয় না। বরং বুক ভরে প্রশান্তির নিঃশ্বাসে সে সর্বাবস্থায় বলতে পারে- আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ্র প্রতি এই দৃঢ় ঈমান ও ইস্তিকামাত যে কোন হতাশা থেকে মুক্তির অব্যর্থ মাধ্যম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দুনিয়াবী পরীক্ষার মঞ্চে সদা-সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল রাখুন এবং যাবতীয় হতাশা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে জীবন পরিচালনার তাওফীক দিন। আমীন!

কুরআনের বঙ্গানুবাদ, মুদ্রণ প্রযুক্তি ও উনিশ শতকের মুসলিম সমাজে এর প্রভাব

*মূল : অমিত দে**

*অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব***

[উনিশ শতকের পূর্বে মুসলমানরা কেন মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ করেনি, কেন বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদে মুসলমানরা এত দীর্ঘ সময় নিল, কেন তৎকালে আরবী ও ফারসীর পরিবর্তে বাংলা বা অন্য কোন ভাষাকে আলেমগণ ধর্মপ্রচারের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেননি, কিভাবে মুদ্রণ প্রযুক্তি মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার বিবর্তনে ভূমিকা রেখেছিল- ইত্যাকার প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। লেখকের অনেক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমাদের দ্বিমত রয়েছে, তবে মৌলিকভাবে তিনি যে যৌক্তিক উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছেন, তাতে যথেষ্ট জ্ঞানের খোরাক রয়েছে। প্রবন্ধটি ঈষৎ সংক্ষেপায়িত আকারে প্রকাশ করা হ'ল।-সম্পাদক]

ভূমিকা :

জ্ঞানের প্রচার কিভাবে ছাপাখানার সাহায্যে মৌখিক রূপ হ'তে মুদ্রিত রূপ লাভ করল, এই রূপান্তর কিভাবে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশে এই রূপান্তরের আদৌ কোন ভূমিকা ছিল কি-না, একজন সমাজবিজ্ঞানীর সম্মুখে এ প্রশ্নগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এফ.সি.আর. রবিনসন *ইসলাম অ্যান্ড মুসলিম হিস্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া*[১] গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, উপরোক্ত প্রশ্নগুলো ইউরোপীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে কমবেশী মোটামুটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ এশীয় মুসলিম সমাজের উপর মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে এখনো যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। আসলে এ জাতীয় গবেষণার ক্ষেত্রে রবিনসন হ'লেন একজন অগ্রসৈনিক। অবশ্য বঙ্গভূমি তার গবেষণায় তেমন স্থান পায়নি যদিও সেখানে বিশ্বের একটি বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী বাস করে। বঙ্গভূমি আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে বাঙালী মুসলিমই হ'ল একমাত্র মুসলিম যারা ইসলাম কবুল করার পরও তাদের ভাষা ও লিপি উভয়টির স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এ সকল কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম-এর উপর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার সময় বঙ্গভূমিকে (অবিভক্ত) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে তার বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা (কোলকাতা, ১৯৯৯) পুস্তিকায় বাংলায় কুরআন অনুবাদের প্রেক্ষাপট তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অবশ্য সেখানে মুদ্রণ প্রযুক্তির আবির্ভাব ও ব্যবহারের সঙ্গে অনুবাদ ক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলা হয়নি। ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিশ্রমলব্ধ এবং তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ বাংলাভাষায় কুরআন চর্চায় (ঢাকা, ১৯৮৬) ঔপনিবেশিক আমলে কুরআনের বঙ্গানুবাদ সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলমানের অবস্থান হ'তে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফলে তার লেখায় একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রায়ই অনুপস্থিত থেকেছে। উপরন্তু তিনি উনিশ শতকের বাঙালী মুসলিম সমাজে মুদ্রণ প্রযুক্তির গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছেন। যাহোক, গবেষণার ময়দানে বিদ্যমান সেই শূন্যস্থান পূরণ করার লক্ষ্যে অত্র প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণাকাল হ'ল উনিশ শতকের শেষার্ধ। কারণ এ সময় একটি শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। এ সময় বাঙালী মুসলিম সমাজ কর্তৃক মুদ্রণ প্রযুক্তি বরণ করে নেওয়া ছাড়াও মূল আরবী হ'তে বাংলায় সমগ্র কুরআন অনুবাদ করার মতো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য বিশ শতক জুড়েও কুরআনের অনুবাদ অব্যাহত ছিল। তবে সে সময় মুসলিম সমাজ কর্তৃক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কারণে উপলক্ষটা ছিল ভিন্ন। এ কারণে আমাদের গবেষণা উনিশ শতকের শেষভাগে সীমাবদ্ধ থাকবে। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে উনিশ শতক ধর্মীয় আলোচনা-পর্যালোচনার শতক হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। বিষয়টি উত্তমরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রবন্ধটি দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ইতিহাসের আলোকে মুদ্রণ প্রযুক্তির আবির্ভাব, বিকাশ ও বাঙালী মুসলিম সমাজের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর শেষভাগে কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

১. জ্ঞান প্রচারে পরিবর্তন : কুরআননির্ভর ধর্মানুভূতির ভিত্তি স্থাপন :

বর্তমান যুগে মুদ্রণ প্রযুক্তি জ্ঞান প্রচারকে ধ্বনি হ'তে দৃশ্যে রূপান্তর করে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করছে। যেমন মুদ্রণ প্রযুক্তি জ্ঞানের মৌখিক বর্ণনাকে দৃশ্যমান মুদ্রিত হরফে রূপান্তর করেছে। স্মর্তব্য যে, মুসলমানরা উনিশ শতকের পূর্বে মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণ করেনি। ইসলাম যে জ্ঞানের মৌখিক বর্ণনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় তা কুরআনের মৌখিক বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভবত এ কারণে মুসলমানরা উনিশ শতকের পূর্বে মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণের আগ্রহ অনুভব করেনি।

প্রশ্ন ওঠে কেন মুসলমানরা উনিশ শতকে এসে মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণ করল? উত্তর বের করা কঠিন নয়। ঔপনিবেশিক আমলে যখন দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে, বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও রাজনৈতিক আদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে, তখন আলেম সমাজ যাদের পক্ষে আর মুসলিম শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতা

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত। লেখকের উক্ত প্রবন্ধটি "BENGALI TRANSLATION OF THE QURAN AND THE IMPACT OF PRINT CULTURE ON MUSLIM SOCIETY IN THE NINETEENTH CENTURY" শিরোনামে ২০১২ সালে *Societal Studies (vol. 4, no. 4)* নামক একটি ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

** শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ফ্রান্সিস রবিনসন, ইসলাম অ্যান্ড মুসলিম হিস্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া. নিউ দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০।

লাভ করা সম্ভব ছিল না, তারা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।[২] যেমন উত্তর ভারতে খৃষ্টান মিশনারীরা পথে-ঘাটে ও বই-পুস্তকে ইসলামকে আক্রমণ করে মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে লাগলো। উপরন্তু বাঙালী হিন্দু ও ব্রাহ্মণ যারা তাদের তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া মুসলিম প্রতিপক্ষের চেয়ে কয়েক দশক পূর্বে নিজেদের অস্তিত্বের সন্ধান শুরু করেছিল, তারা মুদ্রিত বই-পুস্তক হ'তে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লাভ করছিল। এই পরিস্থিতিতে আলেম সমাজ অনুধাবন করলেন যে, স্বয়ং মুসলমানদেরকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে ইসলামকে সর্বোত্তম রূপে হেফাযত করা সম্ভব হবে এবং নবাগত মুদ্রণ প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া যাবে।[৩]

বাঙালী আলেম সমাজ কর্তৃক মুদ্রণ প্রযুক্তি বরণ করে নেওয়ার বিষয়টি বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান নছীহতনামা প্রকাশ ও কুরআন-হাদীছ সহ অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের ভাষান্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৪] আরবী না-জানা বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে এক সময় ছালাত সংক্রান্ত বিষয়াবলিও বাংলায় অনূদিত হয়েছিল।[৫] স্মর্তব্য যে, মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণ করে আলেম সমাজ বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলাতে চাননি; বরং আরো সংহত করতে চেয়েছিলেন। তারা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার ও ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাদের একক কর্তৃত্ব হারাতে চাননি। এ কারণে তৎকালীন সীরাত রচয়িতা আব্দুর রহীমকে তার রচিত সীরাত প্রকাশের পূর্বে আলেম সমাজের অনুমতি নিতে হয়েছিল।[৬]

যাহোক, একবার যখন আলেম সমাজ মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণ করল, তখন জ্ঞান প্রচারের প্রথাগত পদ্ধতি বদলে গেল এবং এভাবে ইলমী ময়দানে আলেমদের একচ্ছত্র আধিপত্য হুমকির মুখে পড়ল। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষাকে কাফিরদের ভাষা মনে করা হ'ত, ফলে কোন ধর্মীয় কিতাবের বঙ্গানুবাদ করা শরী'আত বিরোধী কাজ বলে গণ্য হ'ত।[৭] এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেন হ'লেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি সমগ্র কুরআন মূল আরবী হ'তে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। উপরন্তু তিনি হ'লেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাংলায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী রচনা করেছেন (১৮৮৫)। কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ এদেশীয় ভাষায় ইসলামী কিতাবাদি অনুবাদের ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য ব্রাহ্মণদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, যদিও বহু বাঙালী মুসলিম লেখক তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল।[৮] স্বদেশী ভাষায় অনুবাদ এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির ফলে ধর্মীয় জ্ঞান বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের নিকট সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল এবং ফলশ্রুতিতে অত্র প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে উম্মাহ চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। অতঃপর বাংলা ভাষায় সীরাতসহ অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার ফলে উক্ত চেতনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রণ প্রযুক্তি ও অনুবাদ প্রকল্পের সহযোগে মৌখিক ধ্বনি হ'তে দৃশ্যমান হরফে জ্ঞানের রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মুসলমানরা আলেম সমাজ, বিশেষত উর্দূভাষী আলেম সমাজের তদারকি ব্যতিরেকে ধর্মীয় গ্রন্থাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ পেল। এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ ব্যক্তি নিজে ব্যাখ্যাদানকারী হিসাবে আবির্ভূত হওয়ায় জ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে আলেম সমাজের একক কর্তৃত্ব সীমিত হয়ে পড়েছিল।[৯] এ বিষয়টি বৃহত্তর ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করা উচিত। কারণ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদীয়মান মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ঘটেছিল। সে সময় ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ লাভ করছিল। কর্মব্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না, ধর্মীয় পিপাসা নিবারণের জন্য আলেম সমাজ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণের মানসিকতাও তাদের ছিল না, সময়ও ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনামলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তি নিজের ভূমিকা তালাশ করছিল। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠকোপযোগী শতশত সীরাত গ্রন্থে আলোচিত হয়েছিল। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় নবীকেন্দ্রিক ধর্মচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশে অবদান রেখেছিল এবং ইলমী কর্তৃত্ব আলেম সমাজের হাত হ'তে সরাসরি মুদ্রিত কুরআন বা সীরাত হ'তে নির্দেশনা গ্রহণে সক্ষম শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে অর্পণ করেছিল।

মুদ্রণ প্রযুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আরেকটি দিক ছূফীবাদের প্রতি বাঙালী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগ হ'তে ধর্মীয় বই-পুস্তক স্বদেশী ভাষায় মুদ্রিত আকারে আরো বেশী সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মুখে আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য পুরোপুরি ছূফীবাদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দ্বীনী বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।[১০] শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত কর্তৃক বাংলার ছূফীবাদের সমালোচনা আব্দুল্লাহ (১৯২০) উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।[১১] স্মর্তব্য যে, গ্রামাঞ্চলে শক্ত

---

২. *ফ্রান্সিস রবিনসন, 'ইসলাম অ্যান্ড দা ইমপ্যাক্ট অব প্রিন্ট ইন সাউথ এশিয়া' গৃহীত: এন. ক্রুক সম্পাদিত দা ট্রান্সমিশন অব নলেজ ইন সাউথ এশিয়া: এসেজ অন এডুকেশন, রিলিজিওন, হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স, (দিল্লি : ১৯৯৬), পৃ. ৭০-৭১, ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।*

৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।*

৪. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন এবং মুসলিম ধর্মচিন্তার সেকাল-একাল, গৃহীত: শারদীয় বারোমাস, (কোলকাতা, ১৯৯৬), পৃ. ৪১-৫৭; অমিত দে, বাংলা ভাষী কুরআন চর্চা, (কোলকাতা, ১৯৯৯)।*

৫. *এম. এম. এম. খান, ইসলাম কৌমুদী. খুলনা, ১৯১৪, পৃ. ১২৪।*

৬. *অমিত দে, দ্যা ইমেজ অব দ্যা প্রফেট ইন বেঙ্গলি মুসলিম পয়েট্রি. (কোলকাতা, ২০০৫)।*

৭. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪২।*

৮. *এম. এম. এম. খান, ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯৯।*

৯. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯।*

১০. *ফ্রান্সিস রবিনসন, ২নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭৩-৮৯।*

১১. *আব্দুল কাদির সম্পাদিত. কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী, খণ্ড ১, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩-১২।*

অবস্থানে থাকা উত্তর ভারতের ব্রেলভীদের মতো[১২] বাংলার বাউলরাও অশিক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে ছূফীবাদের ওপর গুরুত্বারোপ অব্যাহত রাখল। আমাদের জানা মতে জ্ঞান বিপ্লবের সেই যুগে প্রথা ভারাক্রান্ত বাউলদের নির্মূল করার জন্য ফৎওয়া জারী করা হয়েছিল। মুদ্রণ প্রযুক্তি জ্ঞান বিপ্লবের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। কারণ বই-পুস্তক তখন বাঙালী মুসলিম সমাজ হ'তে বিভিন্ন রীতিনীতি নির্মূল করার মাধ্যমে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করছিল।[১৩]

ফুরফুরার (হুগলি) পীর আবুবকর এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে বাস্ত বসম্মত উপায়ে ধর্মীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[১৪] 'ইসলাম দর্শন'-এর মতো সাময়িকীগুলো যেগুলো ইসলামী ঐক্যের আহ্বান জানাত, সেগুলো উক্ত পীরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।[১৫] এই ঘটনা স্পষ্ট করে যে, কেন বিশ শতকে কতিপয় বাঙালী মুসলিম লেখক ছূফীবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যদিও তারা এর সুপারিশের দাবীর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না।

আমরা বিশদভাবে দেখিয়েছি কিভাবে মুদ্রিত আকারে ধর্মীয় কিতাবাদির সহজলভ্যতা শিক্ষিত মুসলমানদের উপর ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনী ইলমের মর্ম অনুধাবনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিল। ব্যক্তিগত অনুধাবনের প্রতি গুরুত্বারোপের ফলে মুসলমানরা নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধুমাত্র ছূফীবাদের নিকট নিজেদেরকে সঁপে দেওয়ার পরিবর্তে পার্থিব জীবনে কর্মমুখী হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করল। এই কর্মচেতনা আলেম সমাজকে বিভিন্ন সংগঠনের (আনজুমান) শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল। এজাতীয় সংগঠন বাঙালী মুসলিম জনতা ও সুসংঘবদ্ধ রাজনীতির মধ্যে সংযোগ হিসাবে কাজ করত। একদিকে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ছূফীবাদের প্রভাব কমতে থাকল, অপরদিকে তারা সরাসরি মুদ্রিত কুরআন ও সীরাত হ'তে তাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পিপাসা নিবারণে রত হ'ল। অতঃপর আত্মবিশ্বাসী শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী পীর-মুরশিদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাল এবং জাগতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দলীল হিসাবে গ্রহণ করল।[১৬]

যখন জ্ঞান প্রচার ব্যক্তিগত দায়িত্বে রূপ নিচ্ছিল, তখন মাওলানা আকরাম খাঁ ও মুনীরুয্যামান ইসলামাবাদীর মতো একদল বাস্তববাদী আলেম ধর্মীয় প্রকাশনার জগতে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পরিহাসের বিষয় এই যে, এ জাতীয় প্রকাশনাগুলোও একশ্রেণীর মুসলমানের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম অনুধাবনের দাবী তুলেছিল। যেমন ইতিপূর্বে তারা আলেম সমাজ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কতিপয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম এমন ছিল যে, প্রাত্যহিক জীবনে তাদের শারঈ নির্দেশনা অনুসরণের কদাচিৎ সময় মিলত। তারা ছিল জন্মসূত্রে মুসলিম। গৌর কিশোর ঘোষের উপন্যাস 'প্রেম নেই', এ প্রধান চরিত্র শফীকুল এই নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই শ্রেণীর মুসলমানরা ইজমা, কিয়াস ও ফিকহকে শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, কারণ তাদের দাবী মতে, এগুলো সরাসরি আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কথা নয়, বরং ইমাম ও মৌলভীদের ব্যাখ্যা মাত্র।[১৭]

একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম আলেম সমাজের শরণাপন্ন হওয়ার পরিবর্তে কুরআন, হাদীছ ও সীরাতকে শরী'আতের দলীল হিসাবে বেছে নিল। সন্দেহ নেই যে, এগুলো বঙ্গভূমিতে কুরআননির্ভর ধর্মচর্চার উৎপত্তি ও বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

এভাবে মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে জ্ঞান প্রচারের পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল এবং পরবর্তীতে আলেম সমাজ ও ছূফীদের সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানদের সম্পর্ককে ভিন্ন অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে আমরা বাঙালী মুসলিম ছাপাখানার সমৃদ্ধি ও ইসলামী ঐক্যচিন্তার মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করেছি। তবে ছাপাখানার ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়। কারণ এখনো দক্ষিণ এশিয়ায় সাক্ষরতার হার অতি নিম্নে।[১৮]

২. কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও এর প্রভাব :

১৮৮০-এর দশকে ড. জেমস ওয়াইজ নামে ঢাকার একজন চিকিৎসক উনিশ শতকের সাধারণ বাঙালী মুসলিম সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছিলেন যে, তাদের অধিকাংশ ছিল সাধারণ কৃষক এবং ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অনেকে হিন্দুদের উৎসবে অংশগ্রহণ করত। আলেম সমাজের মধ্যে যারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারা সাধারণ মুসলমানদের হিন্দুদের উৎসবে যোগদান করা হ'তে বিরত থাকার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে ইসলামকে অনৈসলামিক কার্যকলাপ হ'তে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া ও ফরায়েযী আন্দোলনের সময় বাংলার সাধারণ মুসলমানদের একজন প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় আরবীতে ছালাত আদায় করতে বলা হ'ত। কারণ তখন বাঙালী কৃষিজীবী মুসলমানরা আরবীতে ছালাত আদায় করত না। ড. ওয়াইজের বিবরণ থেকে আমরা

১২. *দালি মেটকাফ, বি. ইসলামিক রিভাইভাল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া: দেওবন্দ ১৮৬০-১৯০০ (প্রিন্সটন, ১৯৮২), পৃ. ২৬৭-২৯৬।*
১৩. *ফ্রান্সিস রবিনসন, ২নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭৮।*
১৪. *আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, (কোলকাতা, ১৯৭১), পৃ. ৩৮৩।*
১৫. *ইসলাম দর্শন (কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা, ১৯২১), প্রথম সংখ্যা, প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য।*
১৬. *প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, দা বেঙ্গলি মুসলিমস: আ স্টাডি ইন দেয়ার পলিটিসাইজেশন, ১৯২১-১৯২৯ (কোলকাতা, ১৯৯১), পৃ. ১৬৪।*
১৭. *গৌর কিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, (কোলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ২২৬-২২৮।*
১৮. *ফ্রান্সিস রবিনসন, ২নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯০-৯১।*

জানতে পারি তখন আরবীতে ছালাতের ইমামতি করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল।[১৯]

বাংলায় ইসলাম আগমনের পর হ'তে বেশ কয়েক শতক পেরিয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাহ'লে কেন বাঙালী মুসলমানরা মাত্র ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হাতে পেল? কেন বাংলা তাফসীরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল? দৃশ্যত এজন্য আমরা দু'টি জিনিসকে দায়ী করতে পারি। প্রথমতঃ ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানরা সরকারী ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলিতে উর্দূ ও ফারসী ভাষা ব্যবহার করত এবং উভয় ভাষাতে কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল। তাফসীরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙালী মুসলমানরা উর্দূ ও ফারসী উভয় ভাষা জানত এবং মাঝে মাঝে তারা একে অন্যের সঙ্গে উর্দূ ভাষায় বাক্যালাপ করত।[২০] মোশাররফের পিতা এই শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি উর্দূ ও ফারসী জানলেও বাংলা লিখতে বা পড়তে পারতেন না।[২১] এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানরা বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বই-পুস্তক অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।[২২] পরবর্তীতে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করতে লাগল এবং সম্ভ্রান্ত বাঙালী মুসলমানরা প্রভাবশালী হ'তে শুরু করল, তখন বাঙালী মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষার গুরুত্বও বেড়ে গেল।[২৩]

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী মুসলমানরা কুরআনের অনুবাদ করাকে শরী'আত বিরোধী কাজ হিসাবে বিবেচনা করত। তাদের ধারণা ছিল অনুবাদের ফলে কুরআন তার আসমানী আবহ হারিয়ে ফেলবে এবং সাধারণ মুসলমানরা তা পড়ে গোমরাহ হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মতাত্ত্বিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ১৭৩৭ সনে কুরআনের ফারসী অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এর একশ চুয়াল্লিশ বছর পর ময়মনসিংহ যেলা হ'তে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের হাত ধরে বাংলা কুরআন প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮৮২ সনে। তারপর এল তৃতীয় খণ্ড। শেষ দু'টি খণ্ড কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪]

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে এক হাযার কপি ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় (১৮৯২), তৃতীয় (১৯০৮) এবং চতুর্থ (১৯৩৬) সংস্করণেও সমসংখ্যক মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৮১ সনে যখন প্রথম খণ্ড বের হ'ল, মুসলিম সমাজের এক ব্যক্তি ভাই গিরিশচন্দ্রকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী খণ্ডগুলো সামনে আসার পর কতিপয় মুসলিম পণ্ডিত তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৬ সনে যখন ভাই গিরিশচন্দ্র অনূদিত কুরআনের চতুর্থ সংস্করণ বের হ'ল, তখন প্রখ্যাত ধর্মবিদ ও মুসলিম লীগ নেতা মাওলানা আকরাম খাঁ এটির ভূমিকা লিখেন এবং গিরিশচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। এভাবে বাঙালী মুসলমানরা তাদের ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়।[২৫]

গিরিশচন্দ্র প্রাথমিক পর্যায়ে বেনামে অনুবাদ করেন। কারণ তিনি হয়ত আশংকা করেছিলেন, একজন অমুসলমানের এমন উদ্যোগ বাঙালী মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না-ও হ'তে পারে। এ ধরনের আশংকা অবশ্য অমূলক ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী মুসলমানরা কুরআনের বঙ্গানুবাদ করাকে শরী'আতবিরোধী কাজ বলে বিবেচনা করেছে। একথাও ইতিমধ্যে এসে গেছে যে, বাংলা কুরআনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানদের একজন অনুবাদককে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। যাহোক, কতিপয় মুসলিম পণ্ডিতের ইতিবাচক সাড়া পেয়ে বেনামি অনুবাদক পরবর্তী খণ্ডগুলোতে নিজের নাম প্রকাশের যথেষ্ট সাহস পেলেন। নিজের নাম প্রকাশের পর, ভাই গিরিশচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণে মিশ্র অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা অবশেষে আলোর মুখ দেখেছে। একই সাথে তিনি তার গুরু কেশবচন্দ্র সেন পরলোকগমন করায় শোক প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ নেতা যিনি মূলতঃ গিরিশ চন্দ্রকে ইসলামী বই-পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়ী শিষ্য গিরিশচন্দ্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেছে দেখলে কেশবচন্দ্র খুশিই হ'তেন।[২৬]

কুরআনের প্রত্যক্ষ অনুবাদের ময়দানে রংপুরের (বর্তমানে বাংলাদেশে) আমীরুদ্দীন বসুনিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তবে তার অনুবাদ ছিল অসম্পূর্ণ। কারণ এটি আমপারা অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮০৮ সালে তিনি আমপারা অংশ অনুবাদ করেন এবং দু'ভাষী বাংলায় অথবা পুঁথি আকারে তাফসীরও রচনা করেন (দু'ভাষী বাংলা হ'ল আরবী ও ফারসী শব্দবহুল বাংলা)। পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে এগুলো কাব্য আকারে সরল বাংলায় প্রকাশিত হয়।[২৭] প্রখ্যাত বিদ্বান আনিসুজ্জামান তার শ্রেষ্ঠ গবেষণাকর্ম মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই দু'ভাষী বা পুঁথি রীতি ১৮৬০-এর দশক পর্যন্ত মুসলিম বাঙালিদের সাহিত্যে প্রবল ছিল। এই রীতি বিশেষত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। পুঁথিসাহিত্য জনসাধারণের

১৯. *জেমস ওয়াইজ, নোটস অন দা রেসেজ, (লন্ডন : কাস্টস অ্যান্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল, ১৮৮৩), পৃ. ৩৬; অমিত দে, কুরআন চর্চা, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১।*

২০. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২; অমিত দে, সমাজ ও সংস্কৃতি (কোলকাতা, ১৯৮১), পৃ. ১৩।*

২১. *অমিত দে, 'বাংলায় কুরআন', ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২।*

২২. *আ. কা. মান্নান, (সম্পাদিত) মোশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড (ঢাকা : ১৮৮৫), পৃ. ৯২-৯৫।*

২৩. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২।*

২৪. *প্রাগুক্ত; অমিত দে, ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ২।*

২৫. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩।*

২৬. *অমিত দে, ২০নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৯-২০।*

২৭. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩।*

সম্মুখে পাঠ করে শোনানো হ'ত এবং তাদের মুখস্থকরণের সুবিধার্থে প্রায়ই এগুলো পদ্যে রচিত হ'ত। এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, ঊনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের একটি অংশ সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।[২৮]

আমীরুদ্দীন ছাড়াও, গোলাম আকবর আলী এবং খন্দকার মীর ওয়াহিদ আলী কুরআনের অংশবিশেষ কাব্য আকারে অনুবাদ করেছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সমগ্র কুরআন মূল আরবী হ'তে বাংলায় অনুবাদ করেন। গিরিশচন্দ্রের সময় হ'তে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইসলামের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরও শামিল রয়েছে। ওসব ধর্মীয় রচনাবলি প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমানদেরকে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে সচেতন করেছে। ক্রমশঃ তারা তাদের পৃথক জাতিসত্ত্বার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। এসব ঘটনাবলির সুদূর প্রসারী প্রভাব ছিল।[২৯]

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের বঙ্গানুবাদ করার বা তাফসীর রচনার প্রবল আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তবে প্রশ্ন হ'ল কেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের মতো একজন অমুসলিম ব্যক্তি এধরনের দুরূহ কাজ হাতে নিলেন? তার ও মুসলমানদের অনুবাদ উদ্যোগের মধ্যে কি কোন তফাৎ ছিল? এসব অনুবাদকর্ম কি তুলনামূলক ধর্মচর্চার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল? এ প্রশ্নগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার। উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন তার পূর্বসূরী রাজা রামমোহন রায়ের মতো সারগ্রাহী মানসের অধিকারী ছিলেন। সেন তার সহযোগীদেরকে সকল ধর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের আহ্বান জানান। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে তিনি চারজন নিবেদিতপ্রাণ বিদ্বানকে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে (১৮৩৫-১৯১০) ইসলামের উপর পড়াশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী হওয়ায় গিরিশচন্দ্র কেশব সেনের সমন্বয় প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পক্ষে পুরোপুরি উপযুক্ত ছিলেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কেশব সেন ও তার সহযোগীবৃন্দ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আরো ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।[৩০] ভারতের মতো বহুজাতিক সমাজে যৌগিক সংস্কৃতি গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই যরূরী ছিল। সেই ইতিবাচক পরিকল্পনা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হ'তে পূর্বেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তবে সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ।

যে সকল হিন্দু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান ছিল তাদের এবং মুসলিম ধর্মগুরুদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিল ছিল না। বাংলার যে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিল তাদের মধ্যে অনেক অনৈসলামিক আক্বীদা ও রীতিনীতি বিদ্যমান ছিল। ঊনিশ শতকের মুসলিম সংস্কারকগণ ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে এ সকল অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এটি অবশ্য বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্যও যরূরী ছিল। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের উপর বাংলা ভাষায় বই-পুস্তকের অভাবে ঊনিশ শতকে উক্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র যে উপায়ে বাংলার কৃষিজীবী, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের নিকট ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যেত তা হ'ল গ্রামীণ মসজিদের ইমাম। বহু ইমাম উক্ত কাজ সম্পাদনের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে ঊনিশ শতকের মুসলিম পণ্ডিত ও লেখকগণ মুসলিম জনতার মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করলেন। তারা সাধারণ মুসলমানদের নিকট কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো তুলে ধরার ব্যাপারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তারা আসলে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের ব্যাপারে কদাচিৎ আগ্রহ দেখিয়েছিল। সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ১৮০৪ সালে যখন রামমোহন রায় ফারসী ভাষায় 'তুহফাতুল মুওয়াহিহদীন' (একত্ববাদীদের উপহার) পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন, সমকালীন শিক্ষিত মুসলিম সমাজে এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব পড়েনি।[৩১]

উক্ত পুস্তিকায় রামমোহন কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন। যেহেতু তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, তিনি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। একজন যুক্তিবাদী চিন্তাশীল হিসাবে তিনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে পারেননি যারা নিজেদের ধর্মকে নির্ভুল দাবী করে এবং কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীদের ধর্মের সমালোচনা করে। তিনি বললেন, অন্যান্য মানুষের মতো তাদের পূর্বসুরীরাও ভুল করেছে। তিনি দাবী করলেন, কোন ধর্মই নির্ভুল নয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যুক্তির অভাবে গোঁড়ামি আর ঘৃণা-বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং যারা ধর্মের নামে নর হত্যা বা সহিংসতা চালায় তাদের তিনি তীব্র সমালোচনা করলেন। রায়ের ধর্মদর্শন, বিশেষত ইসলাম ধর্মের উপর তার পর্যালোচনা পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত দেয় তিনি ধর্মকে উদার, মানবিক ও যুক্তিবাদীর অবস্থান থেকে বিচার করেছেন।[৩২]

১৮৮৪ সালে মৌলভী ওবায়দুল্লাহ রামমোহনের 'তুহফাতুল মুওয়াহিহদীন' মূল ফারসী হ'তে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ উক্ত পুস্তিকাটি

২৮. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।*
২৯. *অমিত দে, ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ২ ও ৩।*
৩০. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪।*
৩১. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪।*
৩২. *প্রাগুক্ত।*

ইংরেজী হ'তে বাংলায় অনুবাদ করেন।[৩৩] দৃশ্যতঃ উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানদের তরফ হ'তে এটিকে সাধারণ মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এভাবে ঐতিহাসিক অমলেন্দু দের দাবী প্রমাণিত হয় যে, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানগণ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন না। তারা রায়ের যুক্তিবাদী, মানবিক এবং সারগ্রাহী চিন্তাধারার মূল্যায়ন করতে পারেননি।[৩৪]

ভাই গিরিশচন্দ্রের পূর্বে আমীরুদ্দীন বসুনিয়ার অনুবাদ উদ্যোগ ইতিপূর্বে বিধৃত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথমদিকে দু'ভাষী বাংলায় আমীরুদ্দীনের আংশিক অনুবাদ বাঙালী মুসলিম লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তারা আমীরুদ্দীনের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বীনী মজলিসগুলোতে কাব্যিক দু'ভাষী বাংলায় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞান প্রচার করা হ'ত।

সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, উক্ত রীতিতে আমীরুদ্দীনের আমপারা অংশের অনুবাদ বাঙালী মুসলিম সমাজে ঢেউ তুলেছিল এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তার আংশিক অনুবাদ ও তাফসীর বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য ধারাকে সমুন্নত রেখেছিল। ১৮৬০-এর দশকে গোলাম আকবর আলী এবং মীর ওয়াহিদ আলী কর্তৃক দু'ভাষী বাংলায় কুরআনের আংশিক অনুবাদ উক্ত ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করেছিল। গোলাম আকবর আলী তার কাব্যিক অনুবাদে প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছিলেন।[৩৫]

মজার ব্যাপার হ'ল বাঙালী মুসলমানরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চেয়ে ব্যতিক্রম, কারণ তারা ইসলাম কবুল করা সত্ত্বেও তাদের ভাষা ও লিপি দু'টিরই স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এমনিভাবে প্রচুর পরিমাণে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার বাঙালী মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এমনকি অদ্যাবধি মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় আরবী ও ফারসী শব্দের পরিমাণ হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশী। মীর ওয়াহিদ আলীর পদ্যে রচিত কুরআনের আংশিক অনুবাদ সমকালীন মুসলমানদের মানস, বিশ্বাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি উনিশ শতকের বাঙ্গালি মুসলিম সমাজ নানা কুসংস্কার আর আচার-প্রথায় ছেয়ে গিয়েছিল। বহু নামধারী আলেম এমন কিছু আক্বীদা আর আমলের প্রচার করত যার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক ছিল না।[৩৬]

১৮৭২ সালে নাছিরুদ্দীন আহমাদের 'নিয়ামায়ে খোদা' (আল্লাহ্‌র উপহার) প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তিকাটিতে বিশেষ কয়েকটি সূরার উপর আলোকপাত করা হয়েছিল। ছয় বছর পর ক্বারী নাছিরুদ্দীন ও ছাদিক আলীর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোর (বর্তমানে বাংলাদেশের একটি যেলা) হ'তে 'যীনাতুল ক্বারী' পুস্তিকাটি বের হয়। এতে মূলতঃ কুরআন তেলওয়াতের বেশ কিছু নিয়ম তুলে ধরা হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে বাংলা ভাষায় 'কুরআন-শরীফ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এই আংশিক অনুবাদ করেন।[৩৭]

এই হ'ল ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পূর্বে বাংলা ভাষায় কুরআনকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ইতিহাস। গিরিশচন্দ্রের বাংলা কুরআন ব্যতীত উপরোল্লেখিত অন্য সকল অনুবাদ পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় সমগ্র কুরআন মূল আরবী হ'তে বাংলায় রূপান্তরে বিভিন্নরকম সীমাবদ্ধতা ছিল। একই কথা হাদীছ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলশ্রুতিতে আদি ইসলাম বা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান বাঙালী মুসলিম সমাজে বিরাজ করতে পারেনি। কোন কোন লেখক দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিল করার জন্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার আর গোঁড়ামি ছড়িয়ে দিত। ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে তার সাম্প্রতিক গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছেন 'অর্থোপার্জনের জন্য কতিপয় কাঠমোল্লা নিজেদের বইয়ে উদ্ভট ও কাল্পনিক গালগল্প ঢুকিয়ে দিত যেগুলোর সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই'।[৩৮]

বাঙালী মুসলমানরা গিরিশচন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং পরপর তিনটি সংস্করণে অনুবাদটির জনপ্রিয়তা নিশ্চিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গদ্য ও পদ্য আকারে কুরআন অনুবাদের জোরালো উদ্যোগ দেখা গেল। খৃষ্টান মিশনারীরাও কুরআনের বাংলা অনুবাদ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের তুলনায় খ্রিস্ট ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর হিসাবে সাব্যস্ত করা। ফলে খৃষ্টান মিশনারীদের বাংলা কুরআন বাঙালী মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।[৩৯] একদল মুসলিম গিরিশচন্দ্র অনূদিত কুরআনের উপর সন্দেহ করতে লাগল। যেহেতু বহু মুসলিম তার বঙ্গানুবাদ ক্রয় করেছিল, তাই তার পক্ষে মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপনের খরচ পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি তার বঙ্গানুবাদের কপিরাইট ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'নববিধান ব্রাহ্মণ সমাজ'-কে (ব্রাহ্মণ ও হিন্দু একত্ববাদীদের সংগঠন) প্রদান করেছেন। কতিপয় মুসলিম দাবী করল তিনি মুসলমানদের মধ্যে বঙ্গানুবাদ বিক্রয় করে যে অর্থ লাভ করেছিলেন তা মূলতঃ ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারে ব্যয়িত হয়েছে। পরিণতিতে কতিপয় মুসলিম ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। কিছু মুসলিম গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করায় লিপ্ত হয়েছে। অবশ্য ইতিপূর্বে বলা হয়েছে,

৩৩. *প্রাগুক্ত।*
৩৪. *প্রাগুক্ত।*
৩৫. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।*
৩৬. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬।*
৩৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, বাংলা ভাষী কুরআন চর্চা. ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।*
৩৮. *মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, ৩৯নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৯২; অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭।*
৩৯. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭; মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, ৩৯নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ৪।*

অনেকে তাকে কুরআনের বঙ্গানুবাদের ময়দানে অগ্রদূত হিসাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। তবে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কতিপয় বাঙালী মুসলিম অমুসলমানদের কৃত কুরআনের বঙ্গানুবাদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে।

তাদের আশঙ্কা ছিল অনুবাদের সময় কুরআনের আসমানী আবহকে বিকৃত করা এমন উদ্যোগের মূল অভিসন্ধি হ'তে পারে।[৪০] উনিশ শতকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ এবং কুরআন অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত খৃষ্টান মিশনারীদের তুলনামূলক ধর্মচর্চার জন্য মুসলমানদের সন্দেহপ্রবণতা দায়ী ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাঙালী মুসলিম সমাজে ব্রাহ্ম, আর্য ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব হ'তে সাধারণ মুসলমানদের মুক্ত করার উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। এমন অবস্থায় বাঙালী মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের কৃত কুরআনের বঙ্গানুবাদের উপর আরো বেশী নির্ভরশীল হওয়া খুব সঙ্গত ছিল।[৪১]

মুসলমানদের কৃত কুরআনের বঙ্গানুবাদের ময়দানে মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন (১৮৩৮-১৯০৮) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। করোটিয়ার জমিদার মাহমূদ আলী খান পন্নী এবং ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী বাঙালী মুসলিম সমাজে কুরআনকেন্দ্রিক ধর্মচিন্তা, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। করোটিয়ার জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন কুরআনের বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। ১৮৮৭, ১৮৮৯ ও ১৮৯১ সালে তার বঙ্গানুবাদের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে নাঈমুদ্দীনের এ উদ্যোগ অনেক মুসলিম লেখককে বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার আলেমগণ একযোগে বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কুরআন ও হাদীছের আলোকে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সচেষ্ট হ'লেন।[৪২] বাঙালী মুসলিম সমাজের প্রেক্ষিতে বলা যায়, যশোরের মুন্সী মেহেরুল্লাহ, নদীয়ার শেখ যমীরুদ্দীন ও মাওলানা আনিসুদ্দীন আহমাদের মতো একনিষ্ঠ প্রচারকগণ খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সুধাকর শীর্ষক রক্ষণশীল বাঙালী মুসলিম লেখকদের একটি সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। দলটির নাম এরূপ হওয়ার কারণ হলো সুধাকর শিরোনামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক এটির মুখপত্র ছিল।[৪৩] বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খৃষ্টান মিশনারী, ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজের প্রচারণা থেকে হেফাযত করতে সুধাকর গোষ্ঠীর লেখকগণ বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করত ও প্রবন্ধ রচনা করত। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও মুসলমানরা একইভাবে খৃষ্টান মিশনারী ও আর্যদের ক্রিয়াকলাপের জবাব দিয়েছে। বঙ্গদেশে খৃষ্টান মিশনারীরা ইসলামবিরোধী বই-পুস্তক ও বাংলা কুরআন বিলি করার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি শত্রুতা দেখিয়েছিল।[৪৪]

সন্দেহ নেই যে, মুদ্রণ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে খৃষ্টান মিশনারীদের পক্ষে উনিশ শতকে বাংলায় ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালানো সম্ভব হয়েছিল।[৪৫] ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের জবাবে মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক হক্কানী (১৮৫০-১৯১৫) উর্দূ ভাষায় তাফসীর রচনা করেন। সে যুগে অন্য কোন গ্রন্থ এতটা বলিষ্ঠভাবে ইসলামবিরোধী প্রচারণার মোকাবেলা করতে পারেনি। সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সুধাকর গ্রুপ হক্কানীর তাফসীরের ভূমিকা অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিল। এটি ১৮৮৮ সালে এছলাম তত্ত্ব বা মুসলমান ধর্মের সারসংগ্রহ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার কতিপয় শিক্ষিত মুসলমানের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে পুস্তকটি বের করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে মুহাম্মাদ রিয়াযুদ্দীন আহমাদ এটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মাওলানা ওহীদুদ্দীন ও শেখ আব্দুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১) সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এটির বঙ্গানুবাদে পণ্ডিত রিয়াযুদ্দীন আহমাদ মাশহাদীও (১৮৫৯-১৯১৮) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছলাম তত্ত্ব পুস্তকটি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে এবং সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এখানে স্মর্তব্য যে, অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায়ও উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। ধর্মের প্রাধান্য পরম্পরায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ছূফী মধু মিঞা সম্পাদিত মাসিক প্রচারক-এ ধারাবাহিকভাবে হক্কানীর তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯০১ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ আকারে মুদ্রিত হয়। হক্কানীর তাফসীর অনুবাদ করতে ছূফী মধু মিঞা মাওলানা মনীরুয্যামান ইসলামাবাদীর (১৮৭৪-১৯৫০) প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে খৃষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী প্রপাগান্ডা মোকাবেলায় হক্কানীর তাফসীরটি আলেম সমাজের জন্য একটি সহজলভ্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। উক্ত অনুবাদ ঔপনিবেশিক আমলে বঙ্গদেশে শরী'আত কেন্দ্রিক ধর্মচর্চার এক উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।[৪৬] ১৮৯৩ সালে ছূফী মিঞাজান কামালী একটি উর্দূ কিতাব অনুবাদ করে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা শিরোনামে প্রকাশ করেন। উক্ত কাজ সম্পাদনে তিনি করোটিয়ার জমিদারের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষ

৪০. *অমিত দে, 'বাংলায় কুরআন', ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭৮; মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, ৩৯নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৯৫।*

৪১. *অমিত দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩-৪৯৪।*

৪২. *মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২) পবিত্র কুরআনের টীকাসহ পূর্ণাঙ্গ তরজমা সমাপ্ত করেন। বাংলাভাষায় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক (১৩১৬/১৯০৯)। দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃ. ৪৬৬ ।- সম্পাদক।*

৪৩. *অমিত দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; ঐ, ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ২ ও ৩।*

৪৪. *অমিত দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮, ৯।*

৪৫. *ঐ, ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ২ ও ৩।*

৪৬. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯।*

ভাগে বাঙালী মুসলমানরা কুরআনের ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠেছিল যে পবিত্র কালামের ভাষান্তরে আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বাঙালী মুসলিম সমাজের তরফ হ'তে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হ'ত। যেমন ১৮৯১ সালে ফিলিপ বিশ্বাস অনূদিত বাংলা কুরআন প্রকাশিত হ'লে মুসলমানরা এটির তীব্র সমালোচনা করেছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুসলিমগণ তাদের ধর্ম সম্পর্কে কতটুকু সচেতন হয়ে উঠেছিল, তা তৎকালীন বাংলা সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কুরআনের অনুবাদ ও অনুধাবন প্রচেষ্টার মধ্যে ফুটে উঠেছে।[৪৭]

যেসকল বাঙালী মুসলমানের মধ্যে নেতৃত্বগুণ ছিল, তারা বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে উনিশ শতকে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। মুসলিম ধর্মগুরু, লেখক এবং প্রভাবশালী সরকারী ব্যক্তিবর্গ কামনা করতেন তাদের সম্প্রদায় যেন জাগতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে 'নয়া শিক্ষা' (পশ্চিমা শিক্ষা) গ্রহণ করে। একই সাথে তারা তাদের সাম্প্রদায়িক সংহতি প্রতিষ্ঠায়ও সচেষ্ট ছিলেন। তাদের সম্মুখে 'ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের' দৃষ্টান্ত ছিল।[৪৮] পশ্চিমা শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে একদল হিন্দু তরুণ অতি প্রগতিশীল হয়ে যায় এবং চিরায়ত হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করে। উনিশ শতকের বাঙ্গালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ মোটেই চাননি যে, মুসলিম তরুণরা ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের অনুকরণ করুক। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পশ্চিমা শিক্ষা ও ধর্মীয় দর্শন মুসলিম সমাজে সহাবস্থান করবে এবং সেমতে কাজ করবে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের মধ্যে এই উপলব্ধি জন্মেছিল যে, কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ ছাড়াও ইজমা ও ক্বিয়াসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।[৪৯] অবশ্য ঔপনিবেশিক বাংলার মুসলিম সমাজে 'ইজতিহাদ' প্রসঙ্গটি তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।[৫০] পশ্চিমের রাজনৈতিক উত্থান সত্ত্বেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি নিরাপদ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি দল ইজতিহাদ বা গবেষণার উপর নির্ভর করা নিরাপদ মনে করেছিলেন। ব্যাপক ও নিবিড় ধর্মীয় গবেষণার পরিবেশে ইসলামকেন্দ্রিক উদারতাবাদ, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটেছিল যেগুলো আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল।[৫১] মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস থেকে প্রমাণ মেলে একজন ব্যক্তি নিজ ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের কতিপয় চিন্তাবিদ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অজ্ঞতা দূর করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের বাঙালী মুসলিমগণ সেই উন্নত চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অন্য ধর্মের প্রভাব হ'তে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা।[৫২]

বিশ শতকের প্রথমভাগেও ভারতীয় মুসলমানদের একটি বড় অংশ নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিচয় দিতে থাকল। বিশ শতকেও কুরআনের বঙ্গানুবাদ অব্যাহত ছিল। তবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ এবং ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে বাঙালী মুসলিম কর্তৃক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, যেমনটি গৌর কিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, উক্ত অনুবাদ প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল; এবিষয়ে আরেকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে।[৫৩]

উপসংহার :

অত্র প্রবন্ধে কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও বাঙালী মুসলিম সমাজের উপর মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রভাব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় সাহিত্য চর্চায় বিশেষত কুরআনের ভাষান্তরে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং বিষয়টি বাংলার ইসলামী ঐক্যের প্রেক্ষাপটে বিধৃত হয়েছে। কর্মব্যস্ত ও উদীয়মান শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মোহে আবিষ্ট হচ্ছিল, তারা আলেমসমাজ বা ছূফীদের নিকট গমন করার পরিবর্তে সরাসরি বাংলা কুরআন, তাফসীর ও সীরাত পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা পসন্দ করতেন। ধর্মের প্রতি বা মুদ্রিত আকারে ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ আগ্রহের ফলে বঙ্গভূমিতে কুরআন ও নবীকেন্দ্রিক ধর্মচিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে বিষয়টি ইসলাম প্রচারের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে।

ধর্মীয় জ্ঞান মৌখিকভাবে প্রচারের উপর ইসলামের চিরায়ত গুরুত্বারোপের ফলে মুসলিম সমাজ কর্তৃক মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণে বিলম্ব হয়েছিল। অবশেষে উনিশ শতকে যখন খৃষ্টান মিশনারী, ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুত্ববাদীরা মুদ্রণ প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছিল, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সহ-ধর্মপ্রচারকদের ন্যায় বাংলার মুসলিমরাও ধর্মীয় প্রতিযোগিতার সে যুগে টিকে থাকতে মুদ্রণ

৪৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৯, ১০; মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, ৩৯নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯৮, ১০১১০২।*

৪৮. *অমিত দে, ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ২ ও ৩।*

৪৯. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১১। ইজমা 'সরাসরি কুরআনে উল্লিখিত হয়নি এমন কোন বিষয়ে ধর্মীয় পণ্ডিতদের ঐকমত্য'। ক্বিয়াস 'কুরআন ও হাদীছের মূলনীতির আলোকে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত'। রুকাইয়া ওয়ারিছ মাকছুদ, আ বেসিক ডিকশনারি অব ইসলাম (নিউ দিল্লি : ১৯৯৮, পুনঃমুদ্রণ : ২০০০), পৃ. ১০৩, ১৭৬।*

৫০. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২। ইজতিহাদ- 'সরাসরি কুরআনে বর্ণিত হয়নি এমন কোন বিষয়ে সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে যুক্তির প্রয়োগ করা'। মাকছুদ, রুকাইয়া. ওয়ারিছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।*

৫১. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২। ঔপনিবেশিক ভারতে ইজতিহাদের গুরুত্ব কীভাবে ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে তা মুযাফফর হোসেনের দা ল্যাঙ্গুয়েজ অব পলিটিকাল ইসলাম ইন ইন্ডিয়া (নিউ দিল্লি : ২০০৪) গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।*

৫২. *অমিত দে, বাংলায় কুরআন, ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২।*

৫৩. *প্রাগুক্ত; অমিত দে, ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ২ ও ৩।*

প্রযুক্তি গ্রহণ করেছিল। মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে জ্ঞানের প্রচার মৌখিক হ'তে মুদ্রিত রূপ লাভ করেছিল।

বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলিমগণ সাধারণত একে অপরের সঙ্গে উর্দূ ও ফারসী ভাষায় বাক্যালাপ করতেন এবং স্বভাবতই মূল আরবী হ'তে বাংলায় কুরআনের ভাষান্তরকে শরী'আত বিরোধী কাজ হিসাবে গণ্য করতেন। সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মূল আরবী হ'তে বাংলায় সমগ্র কুরআনের অনুবাদ পেতে বাঙালী মুসলিমদেরকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল যদিও ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের মতো একজন অমুসলিম সেই কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

মুদ্রণ প্রযুক্তি ও কুরআনের বঙ্গানুবাদ নিয়ে আমাদের এই গবেষণায় উনিশ শতকের ভারতীয় মুসলিমদের, বিশেষত বঙ্গীয় মুসলমানদের মানসিক বিবর্তন ফুটে উঠেছে। পশ্চিমের রাজনৈতিক উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য জায়গার সহ-ধর্মপ্রচারকদের মতো বাঙালী মুসলিমরাও শুধুমাত্র জাগতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামী ঐক্য রক্ষা করতে স্বদেশী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও মুদ্রণ প্রযুক্তির মাধ্যমে তা মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে আতর, সুর্মা, টুপি ও জায়নামায পাওয়া যায়।

১ম শাখা : মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে), রাণী বাজার, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫।

২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৩৭-১৫২০৩৬।

জিলানী ডেকোরেটর

এখানে বিবাহ, ওয়ালীমা, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ ওয়াহিদ উদ্দীন (মুকুল)
নওদাপাড়া, টেক্সাইল মোড় (বাইপাস সংলগ্ন আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল ০১৭৩৬-৯৮৯৩৮০, ০১৯৬০-৫৪৫৪৯১

SE শ্রাবণ ইলেক্ট্রনিক্স

আস্থার প্রতীক

মুহাম্মাদ চারু
স্বত্বাধিকারী
মোবা: ০১৭১২-৪৯৮২১৪

সার্ভিস সেন্টার
কম্পিউটার, মনিটর, টিভি, প্রিন্টার, টোনার রিফিল, স্পিকার, ফ্যাক্স ইত্যাদি।

যোগাযোগ : ৮১, নিউ মার্কেট, রাজশাহী

হোটেল এশিয়া

(আবাসিক)

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা

তাবলীগী ইজতেমা'২২ সফল হোক।

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭৩৭২১, মোবাইল : ০১৭১২-৪৩৯০২১

রফিক লেমিনেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

ডিলার : বসুন্ধরা, ফ্রেশ ও পার্টেক্স পেপার

পরিবেশক : টোকা ইনক বাংলাদেশ

এখানে সব ধরনের কাগজ, অফসেট প্রেসের কালি, প্লেট, মোজা, ব্ল্যাংকেট এবং যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়ের কভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল, কার্টুন লেমিনেটিং করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'২২ সফল হোক

যোগাযোগ
৩৮/৩৯, হকার্স মার্কেট, (নিউ মার্কেট), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪

মিয়ানমার ও ভারতের নাগরিকত্ব আইন বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকি

-জামালউদ্দীন বারী

পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্র চীন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সীমান্ত ও আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতে বাংলাদেশ অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকলেও ভারত ও মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনের কারণে সামাজিক বিস্ফোরণের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে। রাখাইনে মিয়ানমার বাহিনী ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের গণহত্যা ও গণধর্ষণের ঘটনাবলী ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিচারের রায়ের ফলাফল যাই হোক, একটি পরিকল্পিত এথনিক ক্লিনজিং বা গণহত্যার দায় কখনো মুছে যায় না। ৯০-এর দশকে রুয়ান্ডায় হুতু মিলিশিয়াদের হাতে লাখ লাখ তুতসি সংখ্যালঘু মানুষ নিহত হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সেখানে একটি বড় ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত ও গণহত্যার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। রুয়ান্ডা গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার আগে যারা এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, জেনোসাইড স্টাডিজ অ্যাকাডেমিসিয়ান ও জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. গ্রেগরি স্ট্যান্টন তাদের অন্যতম। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডা ও বুরুণ্ডিতে মাত্র কয়েক মাসের জাতিগত সংঘাতে ৫ লক্ষাধিক সংখ্যালঘু তুতসিকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই গ্রেগরি স্ট্যান্টন এবার ভারতে অনুরূপ মুসলিম গণহত্যার আশংকা প্রকাশ করেছেন। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিকে তিনি রুয়ান্ডা ও মিয়ানমারের মুসলমানদের অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক স্ট্যান্টন সম্প্রতি 'কল ফর জেনোসাইড অফ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস' শীর্ষক এক কংগ্রেসনাল ব্রিফিংয়ে ভারতে একটি মুসলিম গণহত্যার আশংকার কথা পুর্নব্যক্ত করেন। ইণ্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল এই কংগ্রেসনাল ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, গুজরাট দাঙ্গায় এক হাযারের বেশী মুসলমান নিহত হওয়ার সময় ২০০২ সালেও গ্রেগরি স্ট্যান্টন ভারতে একটি মুসলিম গণহত্যার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। দাঙ্গা ও মুসলিম গণহত্যা প্রতিরোধে তিনি কিছুই করেননি। দাঙ্গা ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদিকে নিষিদ্ধও করেছিল। সেই নরেন্দ্র মোদি দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতে একটি মুসলিম গণহত্যার পটভূমি রচিত হ'তে শুরু করে। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার, সেখানে যোগাযোগ ব্ল্যাক-আউট, সামরিক বাহিনীর বিশেষ শাসন জারি করা, বিচারহীন গুম-খুনের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম বিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন চালুর ঘটনাকে সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও গণহত্যার পটভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ড. গ্রেগরি স্ট্যান্টন।

রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক ভাবমর্যাদা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনার জন্য বড় ধরনের হুমকি। ২০১৭ সালে বা গত দশকেই এই সংকট সৃষ্টি হয়নি। বৃটিশ-ভারতের ভূ-রাজনৈতিক কারসাজি এবং বার্মার সামরিক জান্তার বর্ণবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সমস্যাটি আজকের জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বার্মার পশ্চিমাংশে পর্বত ও নদীবেষ্টিত আরাকান রাজ্যটি বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পশ্চাদভূমি হয়ে ওঠার পিছনে হাযার বছরের ইতিহাস রয়েছে। কথিত আছে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে বার্মা উপকূলে আরব বণিকদের জাহায ডুবে যাওয়ার পর সাতরে আশ্রয় নেওয়া লোকদের বংশধররাই রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। নাফ-নদীর অপর পাড়ে চট্টগ্রামেও তারা বসতি স্থাপন করেছিল।

আরাকানের রোহিঙ্গাদের সাথে চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের লোকজ ভাষা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মিল থাকার কারণে বার্মিজরা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশী বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। আরাকানের সাথে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের শত শত বছরের ঐতিহাসিক পরিক্রমা রয়েছে। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতে বিপর্যস্ত আরাকানের তৎকালীন ম্রু-উক সম্রাট নারামেখলা পালিয়ে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ্‌র কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রায় ২৪ বছর বাংলায় অবস্থানের ফলে নারামেখলা বাংলার মুসলিম সংস্কৃতির দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে সুলতানের সামরিক সহায়তায় নারামেখলা সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। নারামেখলা আরাকানের সিংহাসনে পুনরায় আরোহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরবী মোহরাংকিত স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন। বাংলা থেকে নারামেখলার সাথে সৈনিক হিসাবে আরাকানে যাওয়া মুসলমানরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়েও আরাকানে বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। বাংলার সুলতান উপহার হিসাবে কিছু ভূমিও তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ এবং নারামেখলার মৃত্যুর পর নারামেখলার উত্তরসূরীরা বাংলার ত্রিপুরা ও কুমিল্লার কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল বলে জানা যায়। এভাবেই আরাকানের সাথে বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রাচীন ইতিহাসের গল্প রচিত হয়েছে। রোহিঙ্গারা হাযার বছর আগে বার্মার পশ্চিম উপকূলে বসতি গড়ে সেখানে তাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। হাযার বছর পরে বাঙালী মুসলমান তকমা দিয়ে তাদেরকে আরাকান থেকে বিতাড়িত করতে বৃটিশ-ভারত-পশ্চিমা ও বার্মিজ দূরভিসন্ধি রুখে দিতে না পারলে বাংলাদেশকে অনেক বড় ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হ'তে হবে। বৃটিশ ঔপনিবেশোত্তর সময় থেকে এ তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান অগোছালো, পরিকল্পনাহীন ও অস্থিতিশীল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন ভারতীয় মুসলমানদের অসামান্য (হিন্দুদের চেয়ে বেশী আত্মত্যাগ) ভূমিকা ছিল, একইভাবে ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনেও আরাকানের মুসলমান নেতাদের অসামান্য ভূমিকা ছিল। বার্মা স্বাধীন হওয়ার পর সে দেশের জাতীয় নির্বাচনে বেশকিছু মুসলমান নেতা নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিতে জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন। বৃটিশরা তাদের সর্বশেষ সেনাশাসনে বার্মিজ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির তালিকা থেকে আরাকানের মুসলমানদের বাইরে রাখার যে ষড়যন্ত্রমূলক দূরভিসন্ধি গ্রহণ করেছিল, তার প্রতিফলন হিসাবে সেখানে রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নিপীড়িন শুরু করে। ১৯৫৮ সালে প্রথম হাযার হাযার রোহিঙ্গা মুসলমান রাখাইন থেকে পালিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে চলে এসেছিল। পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক-কূটনৈতিক উদ্যোগে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বেশীরভাগ রাখাইনে ফেরত নিতে বাধ্য হয়েছিল। বার্মিজ সামরিক জান্তার নিপীড়নে ১৯৭৮ সালে আবারো লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে জিয়াউর রহমানের শক্ত কূটনৈতিক ভূমিকার মুখে তাদেরকে ফেরত নিয়ে পুনর্বাসন করতে বাধ্য হয় মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার। এরপর ১৯৮২ সালে বার্মায় নতুন নাগরিকত্ব আইন পাস করা হয়, যেখানে বার্মিজ নাগরিক হিসাবে রোহিঙ্গাদের কোন অবস্থানই স্বীকার করা হয়নি। হাযার বছর ধরে রাখাইনে বসবাস করে বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখার পরও শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণেই রোহিঙ্গা মিয়ানমারের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

একই প্রক্রিয়ায় ভারতেও নতুন নাগরিকত্ব আইনের নামে বিভিন্ন রাজ্যের লাখ লাখ মুসলমানকে রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে ভারতের বিজেপি সরকার। এসব বিষয়কে মিয়ানমার বা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে গণ্য করে বাংলাদেশের চুপ করে বসে থাকার সুযোগ নেই। জাতিসংঘ ২০১৩ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত-নিপীড়িত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি হিসাবে আখ্যায়িত করলেও ২০১৬ সালে জাতিগত নিধনযজ্ঞ ও গণহত্যা শুরুর আগ পর্যন্ত কেউই এ বিষয়ে তেমন প্রতিবাদ বা প্রতিকারের ভূমিকা পালন করেনি। মিয়ানমারের সামরিক জান্তার উপর চীনের প্রভাব এবং ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে পশ্চিমারা রোহিঙ্গা গণহত্যা ও বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে মাঝে মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলতে শোনা যায়। তাদের মৌন সম্মতির কারণে ২০১৭ সালে গণহত্যার মুখে পালিয়ে আসা প্রায় ৮ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিকত্বের স্বীকৃতিসহ পুনর্বাসনের জন্য আন্তর্জাতিক মহলের কোন শক্ত কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে রাজনীতি ও গলাবাজি করা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিনীরাও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের নিয়ে অনেকটা দায়সারা কথাবার্তা বলেই তাদের দায়িত্ব শেষ করছে।

গণহত্যা ও গণধর্ষণ থেকে বাঁচতে ২০১৭ সালের আগস্টে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মন রক্ষা করে প্রথমে ২৩শে নভেম্বর দ্বি-পাক্ষিক প্রত্যাবাসন চুক্তি, অতঃপর ২০১৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী মাঠ পর্যায়ে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আরও ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুই করা যায়নি। মাঝখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের নানা ধরনের চরমপন্থী হুমকিসহ কিছু দ্বান্দ্বিক বিষয়ের প্রস্তাবও দেখা গেছে। মিয়ানমারের পাশে চীনের প্রতিপক্ষরা বাংলাদেশের সাথে একটি ঝামেলা পাকিয়ে তোলার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে বাংলাদেশ তাতে পা দেয়নি। প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে বাংলাদেশের সদিচ্ছার মর্যাদা ভারত বা মিয়ানমার কখনো দেয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়া নাকি রোহিঙ্গাদের সামরিক ট্রেনিং দিয়ে সীমান্তে পাঠানোর হুমকি দেওয়ার পর মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসন করতে বাধ্য হয়েছিল। শান্তির জন্য যুদ্ধের পরিকল্পনা ও সক্ষমতা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। একতরফা শান্তির প্রত্যাশা ও প্রস্তাবনা কখনো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে না। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কখনো কখনো যুদ্ধই হ'তে পারে একমাত্র বিকল্পহীন সমাধান। যুদ্ধ সব সময় রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মাধ্যমেই শেষ হয় না, কূটনৈতিক-সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েও বিজয় নিশ্চিত হ'তে পারে। সামরিক সংঘাত এড়াতে সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের দিকে মনোনিবেশ করা এখন সময়ের দাবী। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও মানবাধিকার প্রশ্নে চীন-ভারত ও পশ্চিমা শক্তিগুলির মধ্যে কিছু বাহ্যিক মতবিরোধ থাকলেও তাদের পুনর্বাসন ও নাগরিকত্বের প্রশ্নে মৌনতার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে অনেকটা অভিন্ন অবস্থানই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধারণা করা যাচ্ছে, বড় ধরনের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ব্যতিরেকে, ফিলিস্তীন বা কাশ্মীরীদের মত রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানও খুব শীঘ্র হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরাসরি আক্রান্ত হওয়ায় রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানবাধিকারের প্রশ্নে বিশ্ব সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আনুসঙ্গিক কার্যক্রমে বাংলাদেশকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হ'লেও ভারতের এনআরসি ও বিজেপির মুসলমান বিদ্বেষী নানামাত্রিক তৎপরতার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে অন্যতম টার্গেটে পরিণত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও জাতিগত সংঘাতের সাথে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নেপথ্য ভূমিকা দেখা গেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে- ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, গুজরাট, রাখাইন, লেবানন, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, রুয়ান্ডা, সোমালিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই হত্যা-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মূলতঃ মুসলমানরাই। এর মানে হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব অঘোষিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ৯০-এর

দশকে স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন ‘দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন’ বা সভ্যতার দ্বন্দ্ব নামে যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন তার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে পশ্চিমা পুঁজিবাদের সাথে ইসলাম তথা মুসলিম বিশ্বের সাংঘর্ষিক অবস্থান। নাইন-ইলেভেনের রহস্যময় সন্ত্রাসী বিমান হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ক্রুসেড বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুসলিম দেশগুলির উপর সামরিক আগ্রাসন অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, গত দুই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলেও মুসলমানদের প্রতি তাদের গৃহীত নীতি এখনো অব্যাহত আছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই সংঘাতে ইসলামী সভ্যতা চৈনিক সভ্যতার সাথে মিলেমিশে একাট্টা হয়ে যেতে পারে। এটা খুবই সাধারণ হিসাব। চীনের রোড অ্যাণ্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভের সাথে পাকিস্তান, ইরান-তুরস্কসহ মধ্য এশিয়ার দেশগুলির অংশগ্রহণ সেই ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তোলে। তবে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের অস্তিত্বের সংকটের প্রশ্নে ভিন্ন প্যারাডাইমও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই নয়, মিয়ানমারের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের উপর নিজেদের স্বার্থের দখল অক্ষুণ্ন রাখতে সেখানে চীন-ভারত ও আমেরিকার মধ্যে এক ধরনের নেপথ্য নিবিড় বোঝাপড়া দেখা যাচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক বোঝাপড়ার কারণে ভারতে বিজেপির ফ্যাসিবাদি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী দাঙ্গায় হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যার পর এখন বর্বর নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলমানকে রোহিঙ্গাদের মত রাষ্ট্রহীন করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের নীরব সমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২শ’ কোটি হ’লেও কোন একক রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসলমানের বাস ভারতে। প্রায় ২৫ কোটি ভারতীয় মুসলমানকে হত্যা বা বিতাড়িত করা কোন রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে হয়তো অসম্ভব। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের নামে, হিন্দুত্ববাদের নামে, ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির মুসলমানদের উপর যেকোন সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে আরও সংহত, কৌশলগত ভূমিকা এবং আভ্যন্তরীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

(সংকলিত)

M.M Brand Shop

Your complate solution

mi

oppo

vivo Smart Phone

Mauen Uddin Shah
01719-792738

এখানে সব ধরনের মোবাইল ফোন ও মোবাইল এক্সেসরিজ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

১ম শাখা : এন আরবি ব্যাংকের সামনে, অলোকার মোড় রাজশাহী
২য় শাখা : থিম ওমর প্লাজা, ৫ম তলা এস্কিলেটর সিঁড়ির সামনে, VIVO শো রুম

THE BISHAL CONFECTIONERY ZONE দি বিশাল কনফেকশনারী জোন

★ মোঃ আবু বাক্কার ★
মোবাইল : ০১৮৬৬-৯৮২৩৭৩, ০১৯২৯-৬১৪৬১৪।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ সফল হৌক

হযরত শাহ্ মুখদুম (রহঃ) মার্কেট, জিরো পয়েন্ট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।-৬১০০

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ সফল হোক!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ বিষয়ক রচনাবলী

৪. ছহীহ ও যঈফ আদাবুল মুফরাদ : ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ থেকে যঈফ হাদীছগুলো[১] বাদ দিয়ে কেবল ছহীহগুলো নিয়ে তিনি উক্ত সংকলনটি রচনা করেন। অতঃপর যঈফগুলো নিয়ে পৃথক একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। উক্ত সংকলনে তিনি কেবল ছাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক হাদীছের নীচে হাদীছের হুকুম সংক্ষেপে পেশ করেছেন এবং প্রখ্যাত মিসরীয় বিদ্বান ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী[২] কৃত তাখরীজ ও তা'লীক্বসমূহ ইলমী গুরুত্বের বিবেচনায় রেখে দিয়েছেন।

হাদীছ এবং আছার মিলে মোট ৯৯৩টি বর্ণনা নিয়ে 'ছহীহুল আদাবিল মুফরাদ' এবং ২১৭টি বর্ণনা নিয়ে 'যঈফুল আদাবিল মুফরাদ' প্রকাশ করেন।[৩]

৫. ছহীহ ও যঈফুল জামেঈছ ছাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু : 'আল-জামি'উছ ছাগীর' ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ)[৪] রচিত হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ সংকলন। আর زيادة الجامع الصغير তাঁর রচিত আরেকটি সংকলন, যা তিনি পূর্ববর্তী সংকলনের সাথে যুক্ত করার জন্য রচনা করেন। কিন্তু সংযোজনের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে শায়খ ইউসুফ নাবহানী (১৮৪৯-১৯৩২) এই অতিরিক্ত অংশকে মূল কিতাবের সাথে সংযোজন করে পুরো বইটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন। আলবানী নাবহানীর উক্ত সংকলনটি তাহক্বীক্ব করেন এবং এর মধ্যকার যঈফ ও জাল হাদীছসমূহ পৃথক করে 'ছহীহুল জামে' ও যঈফুল জামে' নামে পৃথকভাবে সংকলন করেন।[৫] এখানে তিনি সনদ বাদ দিয়ে আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় প্রথমে হাদীছের মতন উল্লেখ করেন। অতঃপর তার নীচে হাদীছটির হুকুম পেশ করেন। ছহীহ সংকলনটিতে মোট ৮২০২টি ছহীহ ও হাসান হাদীছ এবং যঈফ সংকলনটিতে মোট ৬৪৬৮টি যঈফ, যঈফ জিদ্দান ও মাওযূ' হাদীছ সংকলন করেন।[৬]

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি গ্রন্থটি পুনরায় পরিমার্জন করেন। এতে কিছু ভুল সংশোধন হয় এবং কিছু হাদীছের হুকুম পরিবর্তন হয়।[৭] এছাড়া পরবর্তীতে শায়খ যুহাইর শাবীশ ছহীহুল জামে'-এর হাদীছসমূহকে ফিক্বহী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ অনুসারে ভাগ করেন, যা ১৪০৬ হিজরীতে আল-মাকতাবাতুল ইসলামী থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. ছহীহ ও যঈফ সুনানে আরবা'আ : তিনি সুনানে আরবা'আ তথা সুনান আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ-এর সংক্ষিপ্ত তাখরীজ করেন। প্রত্যেক গ্রন্থকে তিনি ছহীহ ও যঈফ দু'ভাগে ভাগ করেন। অভূতপূর্ব এই কাজের জন্য তিনি বহু মানুষের সমালোচনার শিকার হন। এমনকি সমসাময়িক অনেক মুহাদ্দিছ বিদ্বানও তাঁর এই পৃথকীকরণের সমালোচনা করেন। কিন্তু সবকিছুর পরেও তিনি স্বীয় মতে দৃঢ় থাকেন এবং যুক্তি পেশ করেন এ মর্মে যে, 'আমার লক্ষ্য হ'ল মুসলিম উম্মাহর হাতে ছহীহ সুন্নাহকে পৌঁছে দেওয়া। তাই এরূপ পৃথকীকরণ আমার উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল'।

তিনি বলেন, 'প্রায় ৪০ বছর পূর্বে আমি যখন ছহীহ ও যঈফ আবূদাঊদ এবং এরূপ অন্যান্য কাজগুলো করতে শুরু করি, তখন কিছু সম্মানিত ব্যক্তি এরূপ পৃথকীকরণের ব্যাপারে

---

১. *প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে যঈফ বর্ণনা থাকার কারণ কি? এর উত্তর হ'ল- ইমাম বুখারী ছহীহুল বুখারী সংকলনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্তসমূহ আরোপ করেছিলেন, আল-আদাবুল মুফরাদ বা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে সেসব শর্ত আরোপ করেননি। ফলে সেখানে অনেক যঈফ হাদীছ স্থান পেয়েছে, যা পৃথক করা তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। তাই তিনি নিজ থেকে সেগুলোর ছহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে কোন হুকুম পেশ করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীছ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। যাতে পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ সনদের উপর গবেষণা করে ছহীহ-যঈফ বাছাই করে নিতে পারেন। দ্র. মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী : ১৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রি.), প্রশ্নোত্তর নং ৩৭/১৯৭।*

২. *মিসরীয় বিদ্বান মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী (১৮৮২-১৯৬৭ খৃ.) হাদীছে নববীর তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও সূচীপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি হাদীছের শব্দসমূহ আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় সাজিয়ে এক অনন্য সাধারণ সূচীপত্র তৈরী করেন। তিনি যেসব হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে স্ব স্ব কিতাবে সংকলন করেছেন, সেগুলো নিয়ে বিখ্যাত সংকলন 'আল-লু'লু' ওয়াল মারজান ফীমা ইত্তাফাক্বা আলাইহিশ শায়খান' গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দসমূহ নিয়ে 'মু'জামু গারীবিল কুরআন' রচনা করেন। এছাড়া তিনি ছহীহ মুসলিম, মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালিক, সুনানু ইবনি মাজাহ, ফাৎহুল বারী প্রভৃতি গ্রন্থের সূচীপত্র তৈরী করেন এবং সূক্ষ্মভাবে পরিমার্জন করে তা প্রকাশ করেন। দ্বীনী ইলমের ময়দানে প্রভূত খেদমত আঞ্জাম দিলেও বাহ্যিকভাবে তিনি ছিলেন দাড়িবিহীন, মোটা গোফধারী এবং আপাদমস্তক ইংরেজ বেশভূষায় অভ্যস্ত। স্বীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সদা কর্মচঞ্চল, ইখলাছপূর্ণ নিয়তের অধিকারী, স্বল্পাহারী অনন্য প্রতিভাধর এই মানুষটি নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত সারা বছর ছিয়াম পালন করতেন। দ্র. আল-আ'লাম, ৬/৩৩৩; ছহীহুল আদাবিল মুফরাদ (সঊদী আরব : মাকতাবাতুদ দালীল, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৯, টীকা দ্র.; উইকিপিডিয়া।*

৩. *আলবানী, ছহীহুল আদাবিল মুফরাদ, পৃ. ২৮-৩২; জুহূদুশ শায়খ আলবানী ফিল হাদীছ, পৃ. ৬৪।*

৪. *বহু গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (১৪৪৫-১৫০৫ খৃ.) মিসরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি হিজায, শাম, ইয়ামন, ভারত, মরক্কো প্রভৃতি দেশে সফর করেন। শাসক শ্রেণী প্রদত্ত কোন উপহার তিনি গ্রহণ করতেন না এবং তাদের কোন আহ্বানে সাড়া দিতেন না। তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছয় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। দ্র. আল-আ'লাম, ৩/৩০২।*

৫. *জুহূদুশ শায়খ আলবানী ফিল হাদীছ, পৃ. ৬৫।*

৬. *আলবানী, ছহীহুল জামে'ঈছ ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৬-৮।*

৭. *নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৮৫।*

www.at-tahreek.com

একমত ছিলেন না। ...নিঃসন্দেহে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। ...কিন্তু উপরোক্ত পৃথকীকরণের যে উপকার, তাও অস্বীকার করা যায় না। বরং এটা সাধারণ, বিশেষ সকল শ্রেণীর মুসলমানের জন্য অধিক উপকারী। কেননা স্বাভাবিকভাবে সর্বজনবিদিত যে, উপরোক্ত পৃথকীকৃত হাদীছসমূহ (ছহীহ ও যঈফ) একই কিতাবের মধ্যে সংকলিত হ'লে সব ধরনের মানুষের পক্ষে তা মুখস্থ করা স্বভাবগতভাবেই অসম্ভব। বরং অধিকাংশের জন্যই তা দুঃসাধ্য। তবে (তা সম্ভব হবে) যদি ছহীহগুলো একটি কিতাবে এবং যঈফগুলো আরেকটি কিতাবে সংকলিত হয়। ...অতএব আল্লাহ্র নিকট বিনীত প্রার্থনা- তিনি যেন আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন'।[৮]

মূলতঃ 'মাকতাবাতুত তারবিয়াতিল 'আরাবিইয়াহ লি দুওয়ালিল খালীজ'-এর অনুরোধক্রমে তিনি সুনানুল আরবা'আর কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি প্রত্যেকটি হাদীছের সনদসহ হুকুম পেশ করলেও প্রকাশনীর পক্ষ থেকে কেবল হুকুমটুকু রেখে সনদ বাদ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত চারটি সুনানের ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা হ'ল- (১) প্রত্যেক হাদীছের নীচে তার হুকুম পেশ করেছেন এবং স্বীয় তাহক্বীক্বকৃত কোন গ্রন্থে তা সংকলিত থাকলে তা উল্লেখ করেছেন (২) হাদীছের সাথে কোন টীকা পেশ করেননি। এরপরেও যেসব টীকা সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে তা প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে সংযুক্ত (৩) স্বীয় অন্য কোন গ্রন্থে তাখরীজ করা হয়নি, এরূপ হাদীছের ক্ষেত্রে হাদীছ শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী কেবল ঐ সনদের উপর হুকুম পেশ করেছেন। পরবর্তীতে অন্য কোন গ্রন্থে যখন ঐ হাদীছের পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ পেশ করেছেন, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতের ভিত্তিতে হুকুম পরিবর্তন করেছেন। ফলে উভয় হুকুম কখনো পরস্পর বিরোধী মনে হ'লেও বিষয়টি তেমন নয়।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ ও যঈফ পৃথকীকরণের কাজটি আলবানী নিজে করেননি। বরং মাকতাবাতুল ইসলামীর স্বত্বাধিকারী প্রফেসর যুহাইর শাবীশ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ১৪০৬ হিজরীতে 'মাকতাবাতুত তারবিয়াহ' থেকে ছহীহ ও যঈফ পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হ'লেও ১৪১৭ হিজরীতে চারটি গ্রন্থ পৃথক পৃথকভাবে ছহীহ ও যঈফ একত্রে পুরাতন ক্রমিক ঠিক রেখে রিয়াদের 'দারুল মা'আরেফ' থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই সংস্করণটিই অধিক প্রচলিত।[৯]

৭. ছহীহ ও যঈফ সুনান আবী দাঊদ (উম্ম) : সুনান আবূদাঊদের এই সংস্করণটি তিনি ভিন্ন মানহাজে সিলসিলা ছহীহাহ বা যঈফাহ-এর মত বিস্তারিত তাহক্বীক্বসহ বৃহদাকারে সংকলন করতে শুরু করেছিলেন এবং ছহীহ ও যঈফ মিলে ৩২৯৫টি হাদীছ তথা 'কিতাবুল জানায়েয' পর্যন্ত তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করেন। এছাড়া একটি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেন। কিন্তু তিনি তা শেষ করতে পারেননি। ২০০২ সালে কুয়েতের 'মুআসসাতু গার্রাস' থেকে ছহীহ আবূদাঊদটি ৮ খণ্ডে এবং যঈফ আবূদাঊদটি ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৮. মিশকাতুল মাছাবীহ : উক্ত গ্রন্থটি আলবানী ২ বার তাহক্বীক্ব করেন। প্রথম তাহক্বীক্বে সমসাময়িক মুহাদ্দিছ আব্দুল ক্বাদের আরনাঊত্ব এবং মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ তাকে সাহায্য করেন। এখানে মোট ৬২৯৪টি হাদীছের তাহক্বীক্ব করা হয়। যা তিন খণ্ডে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-মাকতাবুল ইসলামী' থেকে প্রকাশিত হয়। তবে এতে তথ্যসূত্রের ঘাটতি থাকায় আলবানী সন্তুষ্ট ছিলেন না। এছাড়া পরবর্তীতে এতে বেশ কিছু ভুল পরিলক্ষিত হওয়ায় তিনি পুনরায় এটি তাহক্বীক্ব করেন, যা মিশকাত তাহক্বীক্ব ছানী নামে পরিচিত। কিন্তু তা পৃথকভাবে আর প্রকাশিত হয়নি।

পরবর্তীতে আলবানীর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে আলবানীর প্রিয় ছাত্র জর্দানের সালাফী বিদ্বান আলী আল-হালাবী তাঁর নিকটে লেবাননের 'মাকতাবা হামীদিইয়াহ'য় সংরক্ষিত মিশকাতুল মাছাবীহের তাখরীজে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) রচিত 'হেদায়াতুর রুওয়াত' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তাহক্বীক্ব করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এতে তিনি খুশী হন এবং উক্ত তাহক্বীক্ব ছানীর মূল পাণ্ডুলিপিটি তাকে সমর্পণ করেন। অতঃপর হালাবী 'হেদায়াতুর রুওয়াত' গ্রন্থটি তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করেন এবং এর সাথে আলবানীর তাহক্বীক্ব সংযুক্ত করেন।[১০]

৯. ছহীহুস সীরাতিন নববীইয়াহ : এটি হাফেয ইবনু কাছীর রচিত আস-সীরাতুন নববীইয়াহ-এর তাহক্বীক্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী সংশ্লিষ্ট ছহীহ বর্ণনাসমূহ সংকলন করেছেন। এছাড়া ইবনু কাছীরের সীরাতের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী পেশ করেছেন। তিনি মাক্কী জীবনের শেষভাগ তথা ইসরা ও মি'রাজ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করতে সমর্থ হন। অতঃপর কাজটি সমাপ্ত করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে ১৪২১ হিজরীতে মাকতাবুল ইসলামী থেকে এটি এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১০. ফিক্বহুস সীরাহ : মিসরীয় বিদ্বান মুহাম্মাদ আল-গাযালী (১৯১৭-১৯৯৭ খৃ.) লিখিত উক্ত গ্রন্থটি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। এখানে লেখক ধারাবাহিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চিত্র অংকন করেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। আলবানী এর বর্ণনাসমূহ তাখরীজ করেন। ফলে এটি পাঠক সমাজের নিকটে আরো গ্রহণযোগ্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়।

১১. যিলালুল জান্নাহ ফী তাখরীজিস সুন্নাহ : ২ খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে ইমাম আবূবকর আহমাদ ইবনু আবী আছেম

---

৮. *আলবানী, যঈফুল আদাবিল মুফরাদ (সঊদী আরব : মাকতাবাতুদ দালীল, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ৬।*

৯. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ পৃ. ৮৬-৮৮; আলবানী, সুনানুত তিরমিযী (ছহীহ ও যঈফ) (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, তাবি), পৃ. ৫-৬।*

১০. *ইবনু হাজার, হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত (মিসর : দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ৩-৮।*

শায়বানী[১১] রচিত 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে সংকলিত হাদীছসমূহের তাহক্বীক্ব ও সনদ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তবে কাজটি তিনি পুরোপুরি শেষ করতে পারেননি। বরং এখানে সংকলিত ১৫৫৯টি হাদীছের মধ্যে ১২০৮টি হাদীছের তাহক্বীক্ব করেছেন। এছাড়া গ্রন্থটির পরবর্তী মুহাক্কিক[১২] প্রফেসর ড. বাসেম-এর বক্তব্য অনুযায়ী আলবানী গ্রন্থটির তাহক্বীক্ব শেষ করার পূর্বে তাঁর অজান্তেই বইটি প্রকাশিত হয়। সেকারণ এখানে কোন টীকা, ভূমিকা ও সূচীপত্র নেই। এছাড়া আলোচনার মাঝে মারাত্মক কিছু ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোন স্থানে রাবীর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, কোন স্থানে একটি হাদীছের তাখরীজ অন্য হাদীছে যুক্ত হয়ে গেছে, হাদীছের কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে ইত্যাদি।[১৩]

১২. আত-তা'লীকাতুল হিসান 'আলা ছহীহ ইবনি হিব্বান : ১২ খণ্ডে প্রকাশিত বৃহদায়তন এই গ্রন্থটি আলবানী শেষ জীবনের কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়। আলবানী ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে কাজটি শুরু করেন এবং মোট ৭৪৪৮টি হাদীছ তাখরীজ করেন। ১৪২৩ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩. ছহীহ মাওয়ারিদিয যামআন ইলা যাওয়াইদে ইবনে হিব্বান : ইমাম ইবনু হিব্বান স্বীয় গ্রন্থে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ ব্যতীত অন্য যে হাদীছসমূহ সংকলন করেছেন, তা নিয়ে হাফেয হায়ছামী (রহঃ) উক্ত গ্রন্থটি হাদীছের সনদ ব্যতীত অধ্যায়ভিত্তিক সংকলন করেছেন। আলবানী ছহীহ ইবনু হিব্বানের তাখরীজ করলেও গুরুত্ব বিবেচনায় এই গ্রন্থটিও তাখরীজ করেন। অনেকে সন্দেহ করে থাকেন যে, তা'লীকুল হিসান গ্রন্থটি আলবানী নিজে তাহক্বীক্ব করেননি বরং পরবর্তীতে তাঁর ছাত্রবৃন্দ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটির উপর আলবানী নিজ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে উভয়টি তিনি নিজ হাতেই সম্পন্ন করে গেছেন।

'মাওয়ারেদুয যামআনে'র শুরুতে তিনি ৮৩ পৃষ্ঠার এক বিশাল ভূমিকা রচনা করেছেন। যেখানে তিনি মাওয়ারেদুয যামআন ও ছহীহ ইবনু হিব্বানের মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। সাথে সাথে ইবনু হিব্বান-এর 'ছিক্বাত' গ্রন্থটি নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তিনি বিস্তারিত দলীল পেশ করে ইবনু হিব্বান যে স্বীয় গ্রন্থে রাবীদের মান নির্ধারণে শৈথিল্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রমাণ করেছেন।

১৪. গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীছিল হালাল ওয়াল হারাম : গ্রন্থটি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী রচিত 'হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম' (ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান)[১৪]-এর তাখরীজ। এখানে তিনি সর্বমোট ৪৮৪টি হাদীছের তাখরীজ করেছেন। এখানে মূলতঃ সংক্ষেপে হুকুম পেশ করা হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত তাখরীজ ও তা'লীক্ব সংযোজন করেছেন। অনেক মাসআলায় তিনি কারযাবীর বিরোধিতাও করেছেন। গ্রন্থটির নাম গায়াতুল মারাম বা 'চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা' রাখার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, কারণ আল্লাহ্র নিকটে আমার একটাই চাওয়া যে, তিনি যেন আমার এই কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত হিসাবে কবুল করে নেন এবং এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমান এবং মুহাক্কিক আহলে ইলম উপকৃত হন।[১৫] উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থে আলবানী মোট ৯০টি হাদীছ যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে ২৬টি হাদীছের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ছহীহ বা হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

১৫. ইকতিযাউল ইলমিল আমাল : খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) রচিত উক্ত গ্রন্থটিতে 'জ্ঞানের চাহিদা হ'ল তদনুযায়ী আমল করা' সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে অনেক হাদীছ, আছার, সালাফে ছালেহীনের মন্তব্য, কবিতা ইত্যাদি জমা করেছেন এবং জ্ঞানান্বেষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমালা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিখনের পর আলবানী এতে সংকলিত মোট ২০১টি হাদীছ ও আছারের তাহক্বীক্ব করেছেন এবং টীকা সংযোজন করেছেন। সাথে সাথে আলোচনার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা যোগ করেছেন। যেখানে তিনি খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) ছহীহ-যঈফ হাদীছ সম্পর্কে উঁচু পর্যায়ের আলেম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আলোচ্য গ্রন্থটিসহ অন্যান্য গ্রন্থে এত বেশী যঈফ হাদীছ সংকলিত হ'ল কেন তার জবাব দিয়েছেন।[১৬]

১৬. তামামুল মিন্নাহ ফীত তা'লীকি 'আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ : মিসরের প্রখ্যাত বিদ্বান শায়খ সাইয়েদ সাবিক (রহঃ)[১৭] রচিত

---

১১. *বছরার এই প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ (২০৬-২৮৭)-এর পিতা, দাদা ও নানা সবাই স্বীয় যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি প্রায় তিনশ' গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০ হাযার হাদীছ সমৃদ্ধ 'আল-মুসনাদুল কাবীর' এবং ২০ হাযার হাদীছ সমৃদ্ধ 'আল-আহাদ ওয়াল মাছানী'। তবে 'কিতাবুস সুন্নাহ' তাঁর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ। দ্র. আল-আ'লাম, ১/১৮৯।*

১২. *আলবানীর মৃত্যুর পর তার ছাত্র রিয়াদের জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের প্রফেসর ড. বাসেম বিন ফয়ছাল আল-জাওয়াবেরাহ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ ও আরো বিস্তারিত তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব সংযোজন করেছেন। দ্র. যিলালুল জান্নাহ ফী তাখরীজিস সুন্নাহ, তাহক্বীক্ব : আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হি.), পৃ. ৫-৭।*

১৩. *আবূ বকর ইবনি আবী আছেম শায়বানী, আস-সুন্নাহ, তাহক্বীক্ব : ড. বাসেম বিন ফয়ছাল আল-জাওয়াবেরাহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুছ ছুমাই'ঈ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮-১৩।*

১৪. *এটি বিশ্বময় জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ। বাংলাসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।*

১৫. *আলবানী, গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজিল হালাল ওয়াল হারাম (দামেশক : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১০-১৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ পৃ. ৯১-৯২।*

১৬. *খত্বীব আল-বাগদাদী, ইকতিযাউল ইলমিল আমাল (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১-৬।*

১৭. *প্রখ্যাত মিসরীয় বিদ্বান সাইয়েদ সাবিক্ব (১৯১৫-২০০০ খৃ.) আযহার বিশ্ববিদ্যালয়-এর শরী'আহ বিভাগে অধ্যয়ন করেন। তিনি 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর সাথে জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন*

'ফিক্বহুস সুন্নাহ' গ্রন্থটি কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত মাযহাবী গোঁড়ামিমুক্ত অনন্য ও পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ। দলীলভিত্তিক আলোচনা, সুন্দর অধ্যায় বিন্যাস, সাবলীল রচনাপদ্ধতি এবং জটিলতামুক্ত শব্দচয়নের কারণে গ্রন্থটি সর্বমহলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনায় আলবানীসহ সমসাময়িক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র ও শিক্ষকগণ তা থেকে ইলমী ফায়েদা হাছিল করতেন। তবে এর মধ্যে কিছু যঈফ হাদীছের সমাবেশ এবং ফিক্বহী ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হ'লে আলবানী এর উপর তা'লীক্ব পেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গ্রন্থটির 'পবিত্রতা' অধ্যায় থেকে 'ছিয়াম' অধ্যায় পর্যন্ত তথা এক-চতুর্থাংশের তা'লীক্ব সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে আর তা করা সম্ভব হয়নি। মূলতঃ তিনি এখানে সংকলিত হাদীছসমূহের প্রয়োজনীয় তাখরীজ ও বিভিন্ন মাসআলাগত ভুল-ত্রুটি, পরস্পর বিরোধী হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধন, ফিক্বহী জটিলতার সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া গ্রন্থের শুরুতে ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। যেখানে উছূলুল হাদীছ ও উছূলুল ফিক্বহের ১৫টি কায়েদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

১৭. মুখতাছারুল 'উলূ লিল 'আলিইয়িল 'আযীম : হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত মূল গ্রন্থটি আল্লাহ তা'আলার আরশে অবস্থান সম্পর্কে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আলবানী গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করেছেন, হাদীছ ও আছার সমূহ তাহক্বীক্ব, তাখরীজ করে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছেন, যঈফ বর্ণনাসমূহ বাদ দিয়েছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ টীকা সংযোজন করেছেন। এছাড়া অর্থগত দিক থেকে কুরআন-হাদীছের বিপরীত কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা এবং মূল ছাহাবী বা তাবি'ঈর নাম ব্যতীত বাকী সনদ বাদ দিয়েছেন। সাথে সাথে গ্রন্থটির প্রথমে এ বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত একটি ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৮] বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আলবানী বলেন, এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক একটি বিষয়। যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যেকার বহু মানুষ পথচ্যুত হয়েছেন। গ্রন্থটিতে এমন একটি মাসআলা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেটা মু'তাযিলা মতবাদের উদ্ভবের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বাসগত দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকর।[১৯]

১৮. আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ফী ফিক্বহিস সুন্নাহ ওয়াল কিতাব : ছহীহ দলীলের সমর্থনে রচিত ফিক্বহী গবেষণাপূর্ণ উক্ত গ্রন্থটি ফিক্বহের ময়দানে তাঁর হাদীছভিত্তিক রচনাসমূহের মধ্যে প্রথম রচনা হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে তিনি 'কিতাবুত ত্বাহারাত' থেকে 'ছালাতে ক্বিবলামুখী হওয়া' অধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা পেশ করেছেন। মৃত্যুর ২ বছর পর তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে মূল পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করে কুয়েতের 'মুআসসাসাতু গার্রাস' দুই খণ্ডে প্রকাশ করে।

১৯. বেদায়াতুস সূল ফী তাফযীলির রাসূল : প্রখ্যাত বিদ্বান ইয ইবনু 'আব্দিস সালাম[২০] রচিত উক্ত বইটিতে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে চমৎকার আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আলবানী এতে বর্ণিত হাদীছসমূহ তাখরীজ করেছেন এবং বিস্তারিত তা'লীক্ব সংযুক্ত করেছেন। সাথে সাথে বইটির শুরুতে ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা রচনা করেছেন। যেখানে তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় অধিকাংশ ছহীহ হাদীছ সংকলিত হওয়ায় আলোচ্য বইটির প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে সনদবিহীন ও কুরআনের আয়াত এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী বহু যঈফ ও জাল বর্ণনা সংকলিত হওয়ায় একই বিষয়ে ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ)-এর লিখিত তিন খণ্ডের বৃহৎ গ্রন্থ 'আল-খাছাইছুল কুবরা'-এর সমালোচনা করেছেন এবং সেখান থেকে এরূপ অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। অথচ সুয়ূত্বী (রহঃ) বইটির ভূমিকাতে সকল প্রকার জাল ও বাতিল বর্ণনা থেকে তা মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। আলোচনার শেষে আলবানী রাসূল (ছাঃ) নামে প্রচলিত জাল-যঈফ হাদীছসমূহ পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসরণের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

২০. আল-আয়াতুল বাইয়েনাত ফী 'আদমি সিমাঈল আমওয়াত : মৃত ব্যক্তিরা যে কোন কিছু শুনতে পায় না সে ব্যাপারে কুরআন-হাদীছ ও বিশেষত হানাফী ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য তুলে ধরে ইরাক্বী বিদ্বান মাহমূদ আলূসী (১৮৩৬-১৮৯৯ খৃ.) রচিত উক্ত সমৃদ্ধ রিসালাটি পাণ্ডুলিপি আকারে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। আলবানী গ্রন্থটির অনুলিপি করেন এবং বিস্তর পরিমার্জনের পর তা প্রকাশ করেন। তিনি সেখানে সংকলিত হাদীছসমূহের তাখরীজ ও তাহক্বীক্ব করেন এবং কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে টীকা সংযোজন করেন। বইটির ভূমিকায় তিনি মাযহাবী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন। অতঃপর 'মৃত সৎ ব্যক্তিগণ যে মানুষের ওযর-আবদার শুনতে পান এবং তা পূরণ করতে পারেন' এই শিরকী আক্বীদা অপনোদনে ৫৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন।[২১]

কারণে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৪৩৪ হিজরীতে ফিক্বহী ময়দানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি বাদশাহ ফয়ছাল পুরস্কার লাভ করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি মক্কাস্থ উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। দ্র. উইকিপিডিয়া।

১৮. আলবানী, মুখতাছার কিতাবুল 'উলূইল 'আলী আল-'আযীম (দামেশক : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১১-২২।

১৯. হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৮৮৩।

২০. সুলতানুল ওলামা ইযযুদ্দীন আব্দুল আযীয বিন আব্দিস সালাম আস-সুলামী (৫৭৭-৬৬০ হি.) দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ও প্রাচীনতম দুই মসজিদ সিরিয়ার উমাইয়া মসজিদ ও মিসরের ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব মসজিদের খত্বীব ছিলেন। তিনি মিসরে কাযী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাতারদের বিরুদ্ধে এবং ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সময় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কাস্থ মাসজিদুল হারাম লাইব্রেরীতে দায়িত্বরত ছিলেন। দ্র. আল-আ'লাম, ৪/২১।

২১. আলূসী, আল-আয়াতুল বাইয়েনাত ফী আদমে সিমা'ইল আমওয়াত 'আলা মাযহাবিল হানাফিইয়াহ আস-সাদাত, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪-৬৯।

২১. রাফউল আছতার লি ইবতালি আদিল্লাতিল ক্বাইলীনা ফানাইন নার : আল্লামা ছান'আনী (১০৯৯-১১৮২ হি.) লিখিত উক্ত গ্রন্থটিতে যেসব ওলামায়ে কেরাম 'জাহান্নাম এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে' বলে মত প্রকাশ করেছেন, তাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দলীল প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। সালাফে ছালেহীনের কেউ কেউ এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেও বিস্ময়কর হ'ল যে, একই মত প্রকাশ করেছেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও তাঁর বিখ্যাত ছাত্র ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)। শায়খ আলবানী এর তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব করেছেন এবং শুরুতে ৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে ভুল সাব্যস্ত করে একে ইজতিহাদী ভুল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁদের মহান খেদমতের তুলনায় এই ভুলকে খুবই সামান্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।

২২. ছহীহ ইবনু খুযায়মা : গ্রন্থটি সমকালীন মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ মুছত্বফা আ'যমী[২২] তাহক্বীক্ব করেছেন এবং আলবানী এর হাদীছসমূহর পুনর্নিরীক্ষণ করেছেন। আ'যমী আলবানীর তাহক্বীক্ব সম্পর্কে বলেন, আমি বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ ব্যতীত ইবনু খুযায়মায় সংকলিত অন্য হাদীছসমূহের উপর ছহীহ, হাসান, যঈফ-এর হুকুম লাগানোর পর এ ব্যাপারে আরও আশ্বস্ত হওয়ার মনস্থ করি। তাই আমি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ উস্তায মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর নিকটে বইটি পুনর্নিরীক্ষণ করার জন্য বিশেষত আমার সংযুক্ত টীকাসমূহ দেখার জন্য অনুরোধ জানাই। আল্লাহ্র শুকরিয়া তিনি আমার চাওয়া গ্রহণ করেন। এজন্য আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন! যেখানে উস্তাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী ছহীহ বা যঈফ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে আমার বিপরীত করেছেন, তখন আমি তাঁর সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেছি। কারণ তাঁর ইলম ও দ্বীনদারীর ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। এছাড়া ইলমী আমানত রক্ষার্থে তাঁর বক্তব্যের পাশে বন্ধনীর মাঝে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেন আমার ও তাঁর বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য করা যায়।[২৩]

এছাড়া তিনি আরো বহু গ্রন্থের তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও তা'লীক করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) লিখিত আল-ইহতিজাজ বিল ক্বাদর, আল-ঈমান, দো'আ বিষয়ক ছহীহুল কালিমিত ত্বাইয়েব, হিজাবুল মারআতি ওয়া লিবাসিহা, ইবনু হামদান আল-হার্রানী (রহঃ)-এর ছিফাতুল ফৎওয়া ওয়াল মুফতী; ইবনু আবীল 'ইয হানাফী রচিত শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিইয়াহ; ইমাম নববী-এর রিয়াযুছ ছালেহীন; ইবনুল জাওযীর ছায়দুল খাত্বের; ইবনু হাজার আসক্বালানীর নুযহাতুন নযর; ইবনুল ক্বাইয়িম-এর ইগাছাতুল লাহফান; ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালীর আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ; ইমাম জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ)[২৪]-এর ইছলাহুল মাসাজিদ মিনাল বিদঈ ওয়াল 'আওয়াইদ; ড. ইউসুফ আল-কারযাবীর মুশকিলাতুল ফিকার ওয়া কাইফা 'আ-লাজাহাল ইসলাম; ইমাম ছান'আনীর সুবুলস সালাম; আল্লামা রশীদ রিযার হুকূকুন নিসা ফিল ইসলাম, শায়খ হাসানুল বান্না সংকলিত আল-মারআতুল মুসলিমাহ; মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর আল-মুছত্বলাহাতুল আরবা'আহ ফীল কুরআন প্রভৃতি। *(চলবে)*

---

২২. মুছত্বফা আ'যমী ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের মৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে তিনি মিসরে গমন করেন এবং ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মক্কার উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার মিশিগান, প্রিন্সটন এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সর্বশেষ রিয়াদের কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর এমিরিটাস হিসাবে কর্মরত আছেন। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী গবেষণার জন্য তাঁকে সম্মানজনক কিং ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। দ্র. সাইয়েদ আব্দুল মাজেদ আল-গাওরী, শায়খ মুছত্বফা আল-আ'যামী ওয়া মুসাহামাতুহুল 'ইলমিইয়াহ ফী মাজালিল হাদীছিন নববী (মালয়েশিয়া : মাজাল্লাতুল হাদীছ, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৮৬-১৯০; উইকিপিডিয়া।

২৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, তাহক্বীক্ব : ড. মুছত্বফা আ'যামী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩২-৩৩।

২৪. ইমাম জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি.) স্বীয় যুগে সিরিয়ার প্রখ্যাত ইমাম, আলেম এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি তাফসীর জগতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাহাসিনুত তা'বীল'-এর রচয়িতা। এছাড়া ক্বাওয়ায়েদুত তাহদীছ মিন ফুনূনি মুছত্বলাহিল হাদীছ তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দ্র. আল-আ'লাম, ২/১৩৫।

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার

মোবাইল : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী

এখানে কেজি স্কুল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই সহ কুরআন মাজীদ ও ইসলামী বইসমূহ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

সমবায় সুপার মার্কেটের দক্ষিণ দিকে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৮২৩-৫৫২০৮৯, ০১৯৪৭-২৬৩১৯৯, ০১৭৯৫-২৮০৫০১।

স্কুল ও মাদরাসার সকল শ্রেণীর সাজেশন, মডেল টেস্ট, হ্যান্ডনোট, বুলেটিন পাওয়া যায়।

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيْمَانْ، 'আল্লাহ যাকে ভালবাসেন এবং যাকে ভালবাসেন না উভয়কেই দুনিয়া দান করেন। কিন্তু তিনি যাকে ভালবাসেন একমাত্র তাকেই ঈমান দান করেন। সুতরাং আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে ঈমান দান করেন'।[১]

২. কাযী শুরাইহ (রহঃ) বলেন, ما أُصِيْبَ عبدٌ بمصيبة الا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لا بد كائنه فقد كانت، 'বান্দা কোন বিপদে পড়েও আল্লাহর তিনটি নে'মত পেয়ে থাকে: (১) বিপদটা তার দ্বীনী বিষয়ে আসেনি; (বরং দুনিয়াবী বিষয়ে এসেছে)। (২) যে বিপদ এসেছে, তার চেয়েও বড় বিপদ আসতে পারত। (৩) যে বিপদটা অবশ্যই আসত, তা এখনই ঘটে গেল (সামনে আর আসবে না)।[২]

৩. হাস্সান ইবনু সিনান (রহঃ) বলেন, بَادِرِ انْقِطَاعَ عَمَلِكَ، فَإِنَّ الْمَوْتَ إِذَا جَاءَ انْقَطَعَ الْبُرْهَانُ، 'আমলের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত আমল কর। কারণ যখন মৃত্যু এসে যাবে, তখন সব যুক্তি-তর্ক বন্ধ হয়ে যাবে'।[৩]

৪. আবূ সুলাইমান আদ-দারানী (রহঃ) বলেন, إِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْغِنَى فَحَسِبُوا أَنَّهُ فِي جَمْعِ الْمَالِ أَلَا وَإِنَّمَا الْغِنَى فِي الْقَنَاعَةِ، وَطَلَبُوا الرَّاحَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَإِنَّمَا الرَّاحَةُ فِي الْقِلَّةِ، وَطَلَبُوا الْكَرَامَةَ مِنَ الْخَلْقِ أَلَا وَهِيَ فِي التَّقْوَى، وَطَلَبُوا النِّعْمَةَ فِي اللِّبَاسِ الرَّقِيقِ وَاللَّيِّنِ وَفِي طَعَامٍ طَيِّبٍ، وَالنِّعْمَةُ فِي الْإِسْلَامِ السِّتْرُ وَالْعَافِيَةُ، 'লোকজন প্রাচুর্য তালাশ করে। তারা মনে করে, ধন-সম্পদ জমানোর মাঝে প্রাচুর্য রয়েছে। অথচ প্রাচুর্য রয়েছে অল্পে তুষ্টির মাঝে। তারা আধিক্যের মাঝে সুখ-শান্তি খোঁজে, অথচ প্রশান্তি রয়েছে অল্পের মাঝে। তারা সৃষ্টির কাছে সম্মান তালাশ করে, অথচ সম্মান নিহিত আছে তাক্বওয়ার মাঝে। তারা নরম-মসৃণ পোষাক এবং ভাল খাদ্যসামগ্রীর মাঝে নে'মত অন্বেষণ করে, কিন্তু নে'মত নিহিত আছে ইসলাম, দোষ-ত্রুটি গোপন থাকা ও সুস্থতার মাঝে'।[৪]

৫. রাগেব ইসফাহানী (রহঃ) বলেন, ذكر الموت يطرد فضول الأمل ويقل من غرور المنى، ويهون المصائب، ويحول بين الإنسان والطغيان، 'মৃত্যুকে স্মরণ অতিরিক্ত কামনা-বাসনা দূর করে, আকাঙ্ক্ষার প্রবঞ্চনা হ্রাস করে, বিপদাপদকে হালকা করে দেয় এবং (স্রষ্টার) অবাধ্যতা ও ব্যক্তির মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়'।[৫]

৬. আবূ হামেদ গাযালী (রহঃ) বলেন, من ذكر الموت، تنولد القناعة بما رزق والمبادرة إلى التوبة، وترك المحاسدة والحرص على الدنيا، والنشاط في العبادة، 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ করে, প্রাপ্ত রিযিকে তার পরিতৃপ্তি আসে, দ্রুত তওবা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুনিয়ার মোহ বিদূরিত হয় এবং ইবাদত-বন্দেগীতে উদ্যম সৃষ্টি হয়'।[৬]

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, والعبدُ كُلَّمَا وَسَّعَ فِيْ أعمال البر وُسِّعَ لَهُ فِيْ الْجَنَّةِ، 'বান্দা যখন নেকীর কাজে স্বীয় বক্ষ প্রসারিত করে, তার জন্য জান্নাতকে সম্প্রসারিত করা হয়'।[৭]

৮. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, مَنِ اعْتَادَ عَلَى التسبيْح قَبْلَ نَوْمِهِ، أَعْطَي نَشَاطاً وَقُوَّةً فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِ وَقُوَّةً فِيْ عِبَادَتِهِ، 'যে ব্যক্তি ঘুমানোর আগে তাসবীহ পাঠে অভ্যস্ত হয়, আল্লাহ তাকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করার শক্তিমত্তা এবং ইবাদত-বন্দেগীতে উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করেন'।[৮]

৯. জুনদুব আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِيْ يَعِظُ النَّاسَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يُضِيءُ لِغَيْرِهِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ، 'যে ব্যক্তি মানুষকে সৎ উপদেশ দেয় নিজেকে ভুলে থাকে, তার উপমা হ'ল সেই প্রদীপের ন্যায়, যে অন্যদের আলোকিত করে, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে'।[৯]

১০. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, يُرِيدُ الْمُسْلِمُونَ إِقَامَةَ الدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ إِقَامَةَ مَسْجِدٍ عَلَى السُّنَّةِ، 'মুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়, অথচ তারা সুন্নাতের ভিত্তিতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না'।[১০]

---

* *এম.এ (অধ্যয়নরত) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৭/১০৫।
২. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকেরীন, পৃ. ১২৩।
৩. ইবনু আবিদ্দুনইয়া, ক্বাছরুল আমাল, পৃ. ১১১।
৪. ঐ, পৃ. ৮১।
৫. রাগেব ইসফাহানী, আয-যারী'আহ ইলা মাকরিমিশ শারী'আহ, পৃ. ২৩৯।
৬. গাযালী, মীযানুল আমাল, পৃ. ৩৯৪।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদিউল আরওয়াহ, পৃ. ৪৭।
৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৭/৪৯৩।
৯. ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৫০।
১০. আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান-নূর : ১০৬৮।

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যুকালীন নছীহত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (৬১-১০১ হি.) ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের স্বনামধন্য খলীফা। তার জীবন ছিল পরহেযগারিতা, দুনিয়াবিমূখতা ও অল্পেতুষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত। তাঁর জীবনের ভাঁজে ভাঁজে উপদেশের খোরাক রয়েছে জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময়কালীন একটি ঘটনা খুবই শিক্ষণীয়। মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন প্রখ্যাত উমাইয়া সেনাপতি ও রাজপুত্র মাসলামা ইবনে আব্দুল মালেক। কথার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সর্বদা আপনার সন্তানদের সম্পদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তারা একেবারেই নিঃস্ব। যদি আমাকে অথবা আপনার পরিবারের যাকে উত্তম মনে করেন তাকে সন্তানদের জন্য অভিভাবক মনোনীত করে যান, তাহ'লে খুবই ভালো হ'ত'।

তার কথা শেষ হ'লে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বললেন, 'আমাকে ধরে বসাও'। তাকে ধরে বসানো হ'লে তিনি বললেন, 'মাসলামা! আমি তোমার কথা শুনলাম। প্রথম যে কথাটি বলেছ যে, আমি আমার সন্তানদের সম্পত্তি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আল্লাহ্‌র কসম! তাদের যে অধিকার রয়েছে, তা থেকে আমি কখনোই তাদের বঞ্চিত করিনি। তবে হ্যাঁ, যেখানে তাদের কোন হক নেই তাদের এর কাছেও ঘেঁষতে দেইনি। আর তোমার দ্বিতীয় কথা– 'তাদের জন্য আমাকে অথবা...'। তাদের জন্য আমি যাকে অভিভাবক মনোনীত করে রেখেছি, তিনি হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি সত্য কিতাব নাযিল করেছেন এবং সৎকর্মশীল বান্দাদের হেফাযতও করেন। আর তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন।

মনে রেখ হে মাসলামা! আমার ছেলেরা হয়ত নেককার পরহেযগার হবে, যাদের আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে ধনী করে দিতে পারেন, যে কোন সমস্যা থেকে বের হওয়ার পথ দেখাতে পারেন। অথবা তারা হ'তে পারে পাপাচারে নিমজ্জিত অসৎ বদকার। এদের অঢেল অর্থের জোগান দিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অবাধ্যতায় আমি সহযোগী হ'তে চাইনি'।

এরপর বললেন, 'আমার ছেলেদের আমার কাছে ডেকে পাঠাও!' সবাইকে ডেকে আনা হ'ল। তারা ছিল ১৩ জন। যখন তিনি তাদের ছেলেদের দেখতে পেলেন, অঝোর ধারায় তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। ছেলেদের বললেন, 'বাবারা! আমি তোমাদের একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাচ্ছি..'। আবার তিনি কান্নায় নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের দিকে তাঁকালেন। সবটুকু ভালোবাসা কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে বললেন, 'আমার বাবারা! ধন-দৌলতের বিচারে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে গেলেও মান-মর্যাদার বিচারে আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি প্রচুর মূল্যবান সম্পদ। এই বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের যে জনপদেই তোমরা যাবে, মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সম্মান করবে তোমাদের।

আমার প্রাণাধিক পুত্ররা! তোমাদের সামনে দু'টো পথ খোলা থাকবে; অন্যায় পথে লব্ধ সম্পদে হয়ত তোমরা ধনী হবে, ফলশ্রুতিতে তোমাদের পিতাকে যেতে হবে জাহান্নামে। অথবা আল্লাহ্‌র হুকুমে অবিচল থেকে দরিদ্রতা স্বীকার করে জীবনের পথে চলতে থাকবে। পুরস্কার হিসাবে তোমরা পাবে জান্নাত। আমি নিশ্চিত যে, এটাই হবে যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানদের প্রকৃত পুরস্কার। এটাই হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদপত্র'।

এরপর তাদের দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তোমরা যাও, আল্লাহ তোমাদের হেফাযত করুন। আল্লাহ তোমাদের সকল অভাব মোচন করুন'। পিতার বুকভরা দো'আ নিয়ে সন্তানরা সেখান থেকে চলে গেল।

এবার মাসলামা কাছে এসে বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমার কাছে ওদের জন্য আরো উত্তম প্রস্তাব আছে'।

-'কী সেটা?'

-'আমার কাছে তিন লক্ষ দীনার আছে। সেগুলো আপনাকে দিচ্ছি, আপনি ওদের মাঝে ভাগ করে দিন অথবা আপনার ইচ্ছামতো অন্য কোথাও দান করুন'।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয বললেন, 'আমি কী এর চেয়েও উত্তম প্রস্তাব দেব তোমাকে?'

-কী সেটা আমীরুল মু'মিনীন!

-এগুলো সেখানে ফিরিয়ে দেবে যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। ওগুলোর ওপর তোমার কোন হক নেই।

অনুশোচনায় ভিজে গেল মাসলামার দু'চোখ। বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আমার পাথরসম হৃদয়কে আপনি কোমল করে দিয়েছেন। বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়া কথা এনে দিয়েছেন স্মরণের সদর দুয়ারে। নেক মানুষের অন্তরে আমাদের স্মরণকে স্থায়ী করে দিয়েছেন'।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যুর পরে মাসলামা তার সন্তানদের খবরাখবর ও অবস্থার প্রতি বিশেষ নযর রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকেই অভাবী, অস্বচ্ছল কিংবা নিঃস্ব পাওয়া যায়নি। *(ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেঈন (কায়রো : দারুল আদাবিল ইসলামী, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ২৬১-২৬৪)*। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল 'আযীম*।

শিক্ষা :

১. নেককার সন্তান গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাকে আগে নেককার হওয়া যরূরী। কেননা পিতামাতার কাছেই সন্তান আদর্শ শেখে।
২. পিতামাতার গাফলতিতে সন্তান বিপথগামী হ'লে তার দায়ভার পিতামাতাকেও নিতে হবে।
৩. যে পিতা সন্তানকে নেককার করে গড়ে তোলেন, মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যেতে না পারলেও তিনি সফল পিতা হিসাবে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে সন্তানদের যদি দ্বীনের পথে গড়ে তোলা না হয়, তাহ'লে তাদের জন্য কাড়ি কাড়ি সম্পদ রেখে গেলেও সেই পিতা ব্যর্থ পিতা হিসাবে বিবেচ্য হন।
৪. সন্তানের জন্য পিতামাতার দো'আ অব্যর্থভাবে কার্যকর হয়। ঠিক তেমনি তাদের বদদো'আও বাস্তবায়িত হয়।
৫. সন্তানের জন্য সম্পদের পাহাড় গড়া সফলতা নয়; বরং তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়াই সবচেয়ে বড় সফলতা।

বছরে পাঁচ কোটি টাকার চারকোল রফতানী করেন নাজমুল ইসলাম

পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে কেউ কেউ এর কাঠি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ পাটকাঠি দিয়ে ঘরের বেড়া দেন। অল্প কিছু এলাকায় এটি অবশ্য পানের বরজে ব্যবহার করা হয়, যাতে পানগাছ বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে পারে। তবে পাটকাঠি থেকে অ্যাকটিভেটেড কার্বন বা চারকোল তৈরি করেও আর্থিকভাবে ওপরে ওঠা যায়।

পাটকাঠির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে দেশে বর্তমানে অন্তত ৩৩টি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করছে। এ রকমই একটি হ'ল তাজী অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি এখন চারকোল রপ্তানির মাধ্যমে বছরে পাঁচ কোটি টাকা আয় করে।

তাজী অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম জানান, পাইরোলাইসিস পদ্ধতিতে পাটকাঠি পুড়িয়ে বেশী ঘনত্বের কয়লা তৈরি করা হয়, যেটির শোষণ ও রাসায়নিক সক্ষমতা অনেক বেশী। এ ধরনের কয়লাকে বাণিজ্যিকভাবে অ্যাকটিভেটেড কার্বন বা চারকোল বলা হয়। প্রতি তিন কেজি পাটকাঠি থেকে এক কেজি কার্বন তথা চারকোল পাওয়া যায়।

তিনি জানান, সুইচ ও বাল্বসহ আরও কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে তিনি পাটকাঠির কয়লা বা চারকোল তৈরির কাজটিও করেন। এ জন্য ঝিনাইদহে ৪৫৬ শতাংশ জমির ওপর একটি কারখানা করেছেন। সেখানে পাটকাঠি পুড়িয়ে চারকোল তৈরি করা হয়। নাজমুল বলেন, পাটকাঠির কয়লা থেকে তৈরি চারকোল মুঠোফোনের ব্যাটারি, বুলেটের বারুদ, প্রসাধনী, প্রিন্টারের কালি তৈরি, পানি শোধনের ফিল্টার, কৃষিজমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোসহ ৫২টির বেশী কাজে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে প্রতি টন চারকোলের দাম বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৬৪ হাযার ৫০০ টাকার সমান।

লক্ষ্মীপুরের ছেলে নাজমুল ইসলাম বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতক সম্মান দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ নিই। সেই গবেষণার কাজে আমি পুরান ঢাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাই। সেই সুবাদে আমি সিএফএল বাল্ব বা বাতি বিক্রির কাজে যুক্ত হই'। নাজমুল জানান, কিছুদিন পরিবেশক হিসাবে ঢাকার আমদানি-কারকদের কাছ থেকে বাল্ব নিয়ে তিনি বিভিন্ন যেলায় বিতরণ করতেন। একপর্যায়ে তিনি সরাসরি বাল্ব আমদানি করতে চীনে যান। তখন সেই দেশে একজনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। নাজমুল বলেন, ২০১০ সালে আমি চীনে গেলে সেই বন্ধু আমাকে তাঁর চাংসা প্রদেশের গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর পরিবারকে পাটকাঠি থেকে অ্যাকটিভেটেড কার্বন তৈরী করতে দেখি। পাটকাঠি থেকে তৈরী হওয়ায় আমি এই ব্যবসায়ে আগ্রহী হই।

ঐ বন্ধুর পরামর্শে নাজমুল চীনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশী পাটকাঠি থেকে চারকোল উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি চারকোল বিক্রির দায়িত্ব নিতে রাযী হন ঐ চীনা বন্ধু। এভাবে যাত্রা শুরু হয় তাজী অ্যাগ্রোর। কারখানা প্রতিষ্ঠায় তিন বছর লাগে। ২০১৩ সালে ঝিনাইদহের সদর উপযেলার অচিন্তপুর গ্রামে তাজী অ্যাগ্রোর চারকোল কারখানা গড়ে ওঠে। সেবারই তাঁরা চীন ও ভারতে চারকোল রফতানী শুরু করেন। প্রথম বছরে রফতানী হয় ২০০ টন, যা এত দিনে কয়েক গুণ বেড়েছে।

আলাপকালে নাজমুল বলেন, বাংলাদেশের পাটের মতো পাটকাঠির মানও বেশ ভালো। ফলে তা থেকে উৎপাদিত চারকোল আন্তর্জাতিক বাজারে ভালো দামে বিক্রি করা যায়। অবশ্য শুরুর দিকে প্রতি টন ১ হাযার ৬০০ থেকে ১ হাযার ৭০০ ডলারে বিক্রি হ'লেও এখন প্রতিযোগিতা বাড়ায় দাম পড়ে গেছে। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান আসার কারণে নিজের একচেটিয়া বাজার খর্ব হ'লেও কাঁচামাল প্রাপ্তি ও পণ্য রফতানিতে সুবিধা হয়েছে বলে মনে করেন নাজমুল।

কানাডাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান 'অ্যালাইড মার্কেট রিসার্চে'র তথ্য অনুযায়ী চলতি ২০২২ সালে বিশ্ববাজারে চারকোলের চাহিদা দাঁড়াতে পারে ২৭ লাখ ৭৬ হাযার টন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০০ কোটি ডলার।

দেশে একে একে বহু পাটকল বন্ধ হওয়ায় এবং প্লাস্টিক পণ্যের দাপটে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার কমে যাওয়ায় মাঝে পাট উৎপাদনে ভাটা পড়েছিল। এখন পাটপণ্যে কিছুটা হ'লেও বৈচিত্র আসায় এবং পাটকাঠির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় দেশে আবারও পাটের উৎপাদন বাড়ছে বলে মনে করেন নাজমুল।

দেশে পাটকাঠি থেকে চারকোল তৈরির ব্যবসায়ে নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকায় সদ্য বিদায়ী বছরে (২০২১ সাল) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) ফাউণ্ডেশন মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলামকে বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার দিয়েছে। নাজমুল আশা করেন, ভবিষ্যতে তিনি শুধু চারকোলই তৈরী করবেন না; বরং এটি ব্যবহার করে যেসব পণ্য তৈরী হয় সেগুলো উৎপাদনের কারখানাও স্থাপন করবেন দেশে।

॥ সংকলিত ॥

মোঃ সুকতার হোসেন
প্রোপ্রাইটার
মোবাইলঃ ০১৯২৭-২৭৫৩২৪
মেসার্স সুকতার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ
এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল, জানালা, দরজা, কলাপসিবল গেট, সার্টার গেট, স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, লোহার সিন্দুক, স্টীল শোকেস, স্টীল খাট, ইত্যাদি প্রস্তুত, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।
বিমান বন্দর রোড, নওদাপাড়া (ব্যাংক এশিয়ার সামনে), সপুরা, রাজশাহী।

ওষুধের অপব্যবহার : সমস্যা ও সতর্কতা

*-ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ**

অসুখ হ'লে ওষুধ খেতে হয়। এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সঠিক নিয়মে ওষুধ খাবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করি না। ওষুধ খেতে আমরা যতটা তৎপর, ওষুধ খাবার নিয়ম মানতে ততটাই উদাসীন। আমাদের এই অবহেলা জীবন রক্ষাকারী ওষুধকে করে তুলতে পারে জীবনবিনাশী বিষ। ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যে অনিয়মটা করি তা হ'ল চিকিৎসকের পরামর্শ না নেয়া। আমরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করি, কখনো আত্মীয়, কখনো বন্ধুর পরামর্শ নেই, কখনো ডাক্তারের চেয়ে ওষুধ বিক্রেতার ওপর বেশী নির্ভর করি। 'অমুক ওষুধে তমুক ভালো হয়েছিল, তাই আমিও ভালো হব– এমন চিন্তাই আমাদের মধ্যে কাজ করে। অথচ লক্ষণ এক হ'লেই অসুখ এক হবে এমন কোন কথা নেই। আবার একই রোগে একই ওষুধের মাত্রা রোগীভেদে ভিন্ন হ'তে পারে। শুধু অসুখে নয়, ওষুধ সহজলভ্য হওয়ায় সুখেও আমরা অন্যের পরামর্শে ওষুধ খাই। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড বা শক্তি বাড়ানোর জন্য ভিটামিন খাই ভাতের চেয়ে বেশী। এসবের মারাত্মক, কখনো জীবনবিনাশী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যদিও বা কখনো (বাধ্য হয়ে) ডাক্তারের পরামর্শ নেই, ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডাক্তারের বেঁধে দেয়া বিধিনিষেধ মানি কম। সময় মতো ওষুধ খাওয়া, খাবার আগে না পরে তা বুঝে খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করা। এসব আমরা খেয়াল রাখি না। বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজের ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি উদাসীন থাকি। সবচেয়ে ভয়াবহ হ'ল ওষুধ বন্ধ করে দেয়া। 'জ্বর ভালো হয়ে গেছে, অ্যান্টিবায়োটিক আর কী দরকার'? ভেবে নিজেরাই ওষুধ বন্ধ করে দেই। আবার অন্য দিকে কয়েকদিনে জ্বর ভালো না হ'লে 'ওষুধ ঠিক নাই' ভেবে তা বন্ধ করে দেই এবং অন্য ডাক্তারের কাছে নতুন ওষুধের প্রত্যাশায় যাই। যেসব অসুখে দীর্ঘ দিন বা আজীবন ওষুধ খেতে হয় সেখানে আমরা অসুখ নিয়ন্ত্রণে এলেই তা বন্ধ করে দেই, বুঝতে চাই না যে রোগ ভালো হয়নি, নিয়ন্ত্রণে আছে কেবল। একসময় লোকমুখে 'ক্যান্সারের ওষুধ' শুনে বাতের ওষুধ বন্ধ করার ঘটনা প্রচুর হয়েছে। ওষুধ শুরুর মতো বন্ধ করার সময়ও আমরা নিয়ম মানি না। যেসব ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করা যায় না তা নিজেরাই হঠাৎ বন্ধ করে দেই।

ওষুধ নিয়ে এই অনাচারে কী ক্ষতি হ'তে পারে? প্রথম কথা যে রোগের জন্য ওষুধ সেবন করা তার উপশম হবে না, বরং খারাপ হ'তে পারে। ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণুর আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি। এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার জীবাণুর বিরুদ্ধে এদের অকার্যকর করে দিচ্ছে। সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যে রোগ শুরুতেই ভালো করা যেত, অপব্যবহারের কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না, নতুন দামী ওষুধ দরকার হচ্ছে, কখনো তাতেও কাজ হচ্ছে না। বিশেষভাবে বলা যায়, যক্ষ্মার কথা যেখানে কমপক্ষে ছয় মাস ওষুধ খেতে হয়, অথচ অনেকেই কয়েক মাস খেয়ে 'ভালো হয়ে গেছি' মনে করে তা বন্ধ করে দেয়। ফলে তা মারাত্মক মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবিতে পরিণত হয় যা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। আর্থিক দিকটাও বিবেচনা করা যরূরী। যে চিকিৎসা এখন সুলভে হচ্ছে, অবিবেচকের মতো ওষুধ খেলে তা পরে ব্যয় বহুল হয়ে যেতে পারে।

শুধু জীবাণু সংক্রমণ নয়, হাই ব্লাড প্রেসার, ডায়বেটিস ইত্যাদি অসুখেও মাঝে মধ্যে ওষুধের ব্যবহার উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে।

নিয়মিত ওষুধ খেলেও যদি সেবনবিধি না মানা হয়, তবে অনেক ওষুধই অকার্যকর হয়ে যায়। খালি পেটে খাবার ওষুধ ভরা পেটে খেলে তা না খাবার মতোই হবে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এক ওষুধ অন্য ওষুধের উপস্থিতিতে কাজ করে না। অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে এসব ওষুধ একত্রে খেলে লাভ তো হবেই না, বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মনের মতো ওষুধ খাবার আরেক সমস্যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। একজন চিকিৎসক ভালো মতোই জানেন কোন ওষুধের কী সমস্যা আর তাই তা কাকে দেয়া যাবে, কাকে যাবে না। নিজে থেকে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা সম্ভব না। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বেশী। ব্যথার ওষুধ খেয়ে পেট ফুটো হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। মোটা হওয়ার জন্য 'স্টেরয়েড' খেয়ে অনেকেই মারাত্মক 'কুশিং সিনড্রোমে' আক্রান্ত হন, যা সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া হঠাৎ ওষুধ বন্ধ করেও অনেকে বিপদে পড়েন। বিশেষ করে স্টেরয়েড হঠাৎ বন্ধ করলে এডিসনিয়ান ক্রাইসিস হ'তে পারে যা থেকে রোগী মারাও যেতে পারে।

সাধারণ ওষুধ, যার অনেকগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই পাওয়া যায়, বিশেষ অবস্থায় তা-ও হ'তে পারে ক্ষতিকর। আমরা অনেকেই জানি না যে ভিটামিন 'এ' বা ক্রিমির ওষুধের মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য 'প্যারাসিটামলে'র মতো ওষুধ হ'তে পারে ক্ষতির কারণ।

এ অবস্থার জন্য দায়ী আমরা সবাই। রোগী যেমন ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া বাহুল্য ভাবছেন, ডাক্তার তেমনি রোগীকে সঠিক পরামর্শ দিচ্ছেন না, আর কর্তৃপক্ষ হয়ে আছেন উদাসীন।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে রোগীর যা মেনে চলা উচিত–

❒ শুধু ডাক্তার পরামর্শ দিলেই ওষুধ সেবন করা যাবে।

❒ বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থা, লিভারের রোগ ইত্যাদি) সাধারণ ওষুধ যা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তা-ও

* অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

ডাক্তারের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে।

❒ শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময় তার মেয়াদকাল দেখে নিতে হবে। মনে রাখবেন, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ আপনার রোগ সারানোর পরিবর্তে ক্ষতি করতে পারে।

❒ ডাক্তার ওষুধ খাবার যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ, কতক্ষণ পরপর, কত দিন, খাবার আগে না পরে ইত্যাদি), সে অনুযায়ী তা সেবন করতে হবে। প্রয়োজনে তা লিখে রাখুন বা মনে রাখতে অন্যের সাহায্য নিন। নিজে থেকে ওষুধের মাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না।

❒ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে ওষুধ কিনে সেবন করবেন না। এতে আপনি স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন। অনেকে নিজে নিজেই দুর্বলতার জন্য ভিটামিন জাতীয় ওষুধ খেতে থাকেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ভিটামিন শরীরের দুর্বলতা দূর করে না। যে কারণে শরীর দুর্বল হয় সে কারণ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত ভিটামিন খেলে তারও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হ'তে পারে।

❒ অনেকে একবার চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বারবার সেই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যত দিন খেতে বলা হয়েছে তত দিনই খাওয়া যাবে। পুনরায় একই অসুখ হ'লেও সেই একই ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।

❒ অনেকে সামান্য কারণেই ব্যথার ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করেন। অনেকে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধও খান। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এভাবে ওষুধ খেলে উপকার তো হবেই না, বরং স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে।

❒ নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করা যাবে না। সুস্থ বোধ করলেও কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে। কোন সমস্যা হ'লে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

❒ একই সাথে এলোপ্যাথিক ও অন্যান্য পদ্ধতির চিকিৎসা চালালে তা ডাক্তারকে জানানো উচিত।

❒ ওষুধ সবসময় আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা, শুষ্ক স্থানে, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। কিছু কিছু ওষুধ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হয়। নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করলে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়, এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

❒ ব্যবহারের সময় ওষুধ ভালো আছে কি-না দেখে নিন। নাম ও মাত্রাটা আবার খেয়াল করুন।

❒ অনেক সময় দোকানদারগণ প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে শুধু বিক্রি করার জন্য অন্য কোম্পানির অন্য ওষুধ দিয়ে থাকেন, বলে 'একই ওষুধ'। এক্ষেত্রে রোগীদের সতর্ক থাকা উচিত এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত নামের ওষুধ কেনা উচিত। ওষুধ কিনার সময় আবার ভালো করে যাচাই করে নেবেন এবং ওষুধ বিক্রেতা লিখিত ওষুধের পরিবর্তে অন্য ওষুধ দিচ্ছে কি-না দেখে নিন।

❒ শিশু ও বয়স্কদের বেলায় আরো বেশী সতর্ক হ'তে হবে। তাদের বেলায় ওষুধের মাত্রা, চোখের ড্রপ বা মলম এবং ইঞ্জেকশনের প্রয়োগবিধির (যেমন গোশতে বা শিরায়) ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এছাড়া চিকিৎসকেরও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে–

❒ রোগীকে রোগ ও ওষুধ সম্পর্কে জানান।

❒ ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানান।

❒ নিজে থেকে বন্ধ করলে কী ক্ষতি হ'তে পারে জানান। কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হ'লে দ্রুত ডাক্তারকে জানানোর পরামর্শ দিন।

❒ কখন ও কিভাবে ওষুধ বন্ধ করা যাবে জানান। নিয়মিত ও নিয়ম মতো ওষুধ খেতে উৎসাহিত করুন।

❒ রোগীর খরচের দিকটা মাথায় রাখুন। অযথা অতিরিক্ত দামী ওষুধ নেহাত প্রয়োজন না হ'লে বা জীবন রক্ষাকারী না হ'লে না লেখাই ভাল।

❒ প্রেসক্রিপশনে অসুখের পূর্ণ নাম, ওষুধের নাম, মাত্রা, খাবার নিয়ম, কত দিন খেতে হবে ইত্যাদি স্পষ্টাক্ষরে সুন্দরভাবে লেখা উচিত।

এর সাথে সাথে ওষুধ বিক্রেতার কর্তব্য প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ বিক্রি করা। শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে যেনতেনভাবে যে কোন ওষুধ বিক্রি না করা। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সরকারী হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করা, দোকানে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা।

ওষুধের অপব্যবহার, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স থেকে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরকে বাঁচাতে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫ মোবাইল : ০১৭১৫-৫৯৫৯৪৫

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

কবিতা

রামাযানের হাতছানি

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

পশ্চিমের ঐ নীল সামিনায়
উঠবে রামাযানের নতুন চাঁদ।
মুমিন মনে হর্ষ লহর মিটিয়ে নিবে স্বপ্নসাধ
কোন পাতকী পঙ্কিলতায় যাচ্ছে ডুবে বর্ষ ভর?
তার জীবনে উঠবে সুরুজ স্বর্ণ কমল নতুন ভোর।
মিটিয়ে নিবে সব গোনাহ তাই ছিয়াম দেয় ঐ হাতছানি
উঠবে হেসে গোলাপকানন ভরবে ঘরের ফুলদানী।
জাগবে হৃদয়ে আল্লাহভীতি আঁকড়ে ধরে সরল পথ
তাই খাবে না হোঁচট কভু চলতে পথে জীবন রথ।
উড়তে যেয়ে পুচ্ছ সবি আযাযিলের ভাঙবে আজ,
বন্দীখানায় কাতরে মরে তাইতো হৃদে দুঃখ-লাজ।
পারবে না সে ভ্রান্ত পথে টানতে আজি মুমিনদের,
পুণ্যে ভরা জীবনতরী রইবে না আর দুঃখ ঢের।
রামাযানেতে কৃপণেরা থাকবে না আর কঞ্জুসে,
দানের খাতায় নাম লেখাবে সব দানবীর দিন শেষে।
রামাযানেরই হাতছানিতে জাগলো সাড়া সবখানে
আল্লাহভীতির শিক্ষা নিতে তাই জড় আজ রামাযানে।

তাবলীগী ইজতেমা

-মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
লালবাগ, দিনাজপুর।

চল যাই যুবক তরুণ নওদাপাড়ার মাঠেতে,
শুনব মোরা কুরআন-হাদীছ দিন ও রাতে।
হৃদয় মোদের তৃপ্ত হবে শীতল হবে প্রাণ,
শুনতে পাব নির্ভেজাল তাওহীদের আহ্বান।
দেশ-বিদেশের হাযার হাযার আসবে মুসলমান,
নিয়ে যাবে সবে তারা অহি-র ফরমান।
চল যাই সবাই মিলে রাজশাহীর নওদাপাড়ায়,
জীবন বদলাতে চল যাই তাবলীগী ইজতেমায়।
১০ ও ১১ই মার্চ ২০২২ বৃহস্পতি ও শুক্রবার,
৩২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় যাব সবাই এবার।
খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের মিলনমেলা সেখানে,
বিধি-বিধান শিখবো মোরা যা আছে দ্বীন ইসলামে।
যাব সবে দলবেঁধে ইজতেমার ময়দানে,
চলব সবাই সারা জীবন অহি-র বিধান মেনে।
সমাজে প্রচলিত যত শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার,
সেসব ছেড়ে সবাই মোরা করব আমল সংস্কার।
ইজতেমার ময়দান থেকে শুনব যেসব বয়ান,
মানব সেসব গড়ব জীবন হব সকলকাম।

বিশ্ব মুসলিম খাচ্ছে মার

-মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
বসুয়া অচিনতলা, রাজপাড়া, রাজশাহী।

মহানবী (ছাঃ) বলে গেছেন বিদায় হজ্জের ভাষণে
দু'টি জিনিস রেখে গেলাম তোমাদেরই স্মরণে।
যতদিন কুরআন-হাদীছ আঁকড়ে ধরে রাখবে
ততদিন তোমরা সবে সঠিক পথে থাকবে।
কভু যদি ভুলে যাও এ দু'টির বাণীকে
পথহারা হয়ে যাবে ডুবে শয়তানীতে।
মুখে বল কুরআনকে ফুল কোড অফ ইসলাম
কাজের বেলায় বলে কেউ অস্পষ্ট এর বিধান।
কুরআনের ব্যাখ্যা হ'ল নবীর বাণী হাদীছ
না পড়ে না বুঝে করলে তোমরা নালিশ।
নতুন রূপে ইজমা-কিয়াস তৈরী তোমরা করলে
শান্তির ধর্ম ইসলামকে দলে দলে ভাঙলে।
কবরপূজা মাযারপূজা শিরক-বিদ'আতের কারণে
বিশ্ব মুসলিম খাচ্ছে মার তাইতো আজ সবখানে।

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে)
রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

স্বদেশ

৪০ হাযার টাকা আত্মসাতের মামলা শেষ হ'তে ৪০ বছর

হাট ইজারার ৪০ হাযার টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন রাজশাহী চারঘাটের ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সোবহান। এ ঘটনায় ১৯৮২ সালের ৯ই জুন তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো। তদন্তের পর চার দশক ধরে মামলাটি পরিচালনা করছিল দুর্নীতি বিরোধী এই রাষ্ট্রীয় সংস্থা। অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে গত ২৭শে জানুয়ারী মামলাটির নিষ্পত্তি হয়। অবশ্য ততোদিনে মামলার আসামিও পাড়ি দিয়েছেন পরপারে।

দুদকের পক্ষের আইনজীবী শাহীন আহমাদ জানান, ৩টি হাট লিজ দেয়াকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো ১৯৮২ সালের ৯ই জুন মামলা করে চারঘাট থানায়। মামলায় সাড়ে ৪০ হাযার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। ১৯৮২ সালে আসামি আব্দুস সোবহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। বিচার শেষে ১৯৮৭ সালে রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে তাকে ৫ বছরের জেল ও ৪২ হাযার টাকা জরিমানা করা হয়। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে হাইকোর্টে আপিল করেন আব্দুস সোবহান। অতঃপর ২০০১ সালে তিনি মারা যান। অতঃপর দীর্ঘ দিন পর আপিলটি নিষ্পত্তি হ'ল।

[এরূপ বিচার প্রক্রিয়ায় কিভাবে দেশে দুর্নীতি দমন হবে? (স.স.)]

দেশে প্রতিদিন ক্যান্সারে মারা যায় ২৭৩ জন

অসংক্রামক রোগ ক্যান্সারের কারণে বাংলাদেশে প্রতিদিন অন্তত ২৭৩ জনের মৃত্যু হয়। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঢাকার মহাখালীস্থ ক্যান্সার হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য দেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও জীবনযাত্রা উন্নয়নের পাশাপাশি ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন প্রায় ২০ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত। প্রতি বছর আরও প্রায় এক থেকে দেড় লাখ মানুষ এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে এই তালিকায়। প্রতিবছর মৃত্যুও হয় লাখের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ঢাকার বাতাস ভালো না, নদীনালায় শিল্পবর্জ্য ফেলা হয়। খাবারে ভেজাল মেশানো হয়। এসব দূষণের কারণে ফুসফুস, গলার ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হয়। এসব বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে।

[ক্ষমতাসীনরা যদি অপারগ হন, তাহলে কারা এগুলো দমন করবে? (স.স.)]

কোয়ালিটি ফার্নিচার

প্রোঃ মোঃ নাজমুল হোসেন

অভিজাত আসবাবপত্র বিক্রেতা

এখানে আকর্ষণীয় ডিজাইনের বিভিন্ন ধরনের মান সম্মত রেডিমেড ফার্নিচার সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক আসবাবপত্র সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২৪-৫১৩৬৩৪, ০১৭৬৪-৮৭৪৯৮৯, ০১৭১১-৩০২৯৬৬।

সম্পদ নিয়ে সন্তানদের লড়াই, ২৪ ঘন্টা পড়ে থাকল পিতার মরদেহ

ফীরোয ভুঁইয়া। সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা। মারা যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে দাফন করা হয়নি। সম্পদের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সন্তানদের দ্বন্দ্বে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লাশে পচন ধরায় এলাকাবাসী চাঁদা তুলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স এনে লাশ রাখার ব্যবস্থা করেন। অমানবিক এই ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়।

সাবেক এই ব্যাংকার গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মারা যান। ২৪ ঘণ্টা পরও শনিবার সন্ধ্যায় মরদেহ পড়েছিল বাড়ির নীচতলার গ্যারেজে। আঙিনায় ছিল না কোনো শোকের আবহ। পাশে ছিল না স্বজনদের উপস্থিতি। নিচে পিতার লাশ রেখে উপরে সম্পদ নিয়ে দুই সন্তানের কাড়াকাড়ি। সন্তানদের এমন হৃদয়হীন আচরণে মীমাংসা খুঁজতে শালিশে বসে এলাকাবাসী!

কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন বড় ছেলে রাকীবের অভিযোগ, সম্পত্তির লোভে ছোট ভাই পিতাকে হত্যা করেছে। সে মাকে মারধর করে। পাঁচতলা বাড়ি ও পিতা-মাতার অবসরের এক কোটি টাকা এবং নরসিংদীর আরও একটি বাড়ি নিজের নামে লিখে নিয়েছে। ফীরোয ভুঁইয়ার স্ত্রী খাদীজার অভিযোগও তার ছোট ছেলে আবীরের দিকে। নিজের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, 'দরজায় হাত রেখে চাপা দিয়ে আমাকে নির্যাতন করতো ছোট ছেলে। সন্তানের নির্যাতনের ভয়ে আমাকে প্রতিবেশীর আশ্রয়ে থাকতে হত'। অন্যদিকে ছোট ছেলে আবীরের দাবী, পিতা তাকে সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আবীর পিতাকে সঠিক চিকিৎসা করতে দেয়নি। কষ্ট দিয়েছে। মানুষটা না খেয়ে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন।

ফীরোয ভূঁইয়ার মৃত্যুর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর পুলিশ এসে অ্যাম্বুলেন্সে মরদেহ পাঠায় গ্রামের বাড়ি নরসিংদীতে। তারপর সেখানেই দাফন সম্পন্ন হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ব্যাংকে নিজের নামে কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও ঢাকার বাসার তৃতীয় তলায় পরিত্যক্ত আসবাবপত্র রাখার স্টোর রুমে থাকতেন ফীরোয ভুঁইয়া ও তার স্ত্রী খাদীজা।

[দ্বীনী শিক্ষা না থাকলে এটাই হয় তাদের পরিণতি! এ থেকে সবাইকে শিক্ষা নেওয়া আবশ্যক (স.স.)]

হাফেয আবশ্যক

দারুল ফোরকান হিফয মাদ্রাসা, ফেনী

উক্ত মাদ্রাসায় তিন জন (৩) হাফেয নিয়োগ দেওয়া হবে।

❖ বেতন : ১২ হাযার থেকে ১৮ হাযার টাকা (আলোচনা সাপেক্ষে)।

❖ অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা :

মুহতামিম, দারুল ফোরকান হিফয মাদ্রাসা,
আসলাম খাঁন ম্যানশন (গ্রীন স্কুল ফেনী ভবন),
পাঠান বাড়ি, ফেনী।
মোবা : ০১৬৩০-৪৫৪৫৯১, ০১৮৬৯-৫৬৯৭১৭।
E-mail: darulforkanhifjmadrasha@gmail.com

বিদেশ

নারীরা হিজাব পরে না বলেই ভারতে ধর্ষণ বেশী

ভারতের কর্ণাটকে চলমান হিজাব-বিতর্কের মধ্যেই পরিস্থিতি যেন আরও উসকে দিল রাজ্যের কংগ্রেস বিধায়ক যমীর আহমাদের মন্তব্য। তিনি বলেন, ভারতে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশী, কারণ বেশীর ভাগ নারী হিজাব পরেন না। যমীর আহমাদ বলেন, 'ইসলামে হিজাব মানে পর্দা। একটা বয়সের পর মেয়েদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে হিজাব ব্যবহার করা হয়'। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের উদুপি শহরে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে পারবেন না-এমন নোটিশ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কর্ণাটকের স্কুল-কলেজের সে আন্দোলন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে। উদুপি'র সরকারী কলেজে ছয় ছাত্রী এ নিয়ে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন।

[ধন্যবাদ যমীর আহমাদকে। কিন্তু বাংলাদেশ সুশীলরা চুপ কেন (স.স.)]

আমেরিকার মুসলিম শাসিত প্রথম শহর হ্যামট্রামক

গত নভেম্বর ২০২১-এর নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিম পরিচালনাধীন শহর হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। এর সিটি কাউন্সিলের নির্বাচিত সব সদস্য মুসলিম। এমনকি প্রথমবারের মতো এবার সিটি মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন ইয়েমেনী বংশোদ্ভূত আমেরিকান চিকিৎসক ডা. আমীর গালিব (৪২)। অনেক বছর ধরে নানা বৈষম্যের সম্মুখীন হয়ে সেখানকার মুসলিমরা এখন শহরের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে মুসলিমদের মধ্যে এখন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। শহরের পথ ধরে চললে দোকানের সাইনবোর্ড সমূহে আরবী ও বাংলা লেখা দেখা যায়। এখানকার অধিকাংশ মুসলিম গুরুত্বের সঙ্গে নিজ ধর্ম পালন করে। সিটি মেয়র ডা. গালিব বলেন, আমি গর্ব বোধ করি এবং আমি একটি বড় দায়িত্ব অনুভব করছি। ইসলাম আমাদের ভালো কাজ করা, মন্দ কাজ এড়িয়ে চলা, অন্যদের সম্মান করা এবং সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করতে উৎসাহিত করে।

পিউ রিসার্চ সেন্টার থিংক ট্যাঙ্ক এক প্রতিবেদনে জানায়, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৮৫ মিলিয়ন মুসলিম বসবাস করছে, যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.১ ভাগ। ২০৪০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমরা খ্রিস্টানদের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। উল্লেখ্য যে, এখানকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে খ্যাত। এছাড়াশহরটির ব্যাপারে 'দুই বর্গ মাইলের বিশ্ব' বলে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। কেননা পাঁচ বর্গ কিলোমিটারের এ শহরে ৩০টির বেশী ভাষার ২৮ হাযার মানুষ বসবাস করেন।

[আমরা ডা. আমীর ও হ্যামট্রামক শহরের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। এর মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে পাই। যেখানে তিনি বলেছেন, ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না... (আহমাদ, হাকেম, মিশকাত হা/৪২: ছহীহাহ হা/৩: (স.স.)]।

গোপন মহামারী এএমআর : ১ বছরে ১২ লাখ মৃত্যু

অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ১২ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত এক ব্যাপক-ভিত্তিক গবেষণা থেকে জানা গেছে। এইডস কিংবা ম্যালেরিয়াতে প্রতিবছর যত সংখ্যক লোক মারা যায়, এই সংখ্যা তার দ্বিগুণ বলে গবেষণায় জানা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ২০৪টি দেশে এই গবেষণা চালান।

এর থেকে রক্ষা পেতে হ'লে ওষুধ নিয়ে গবেষণায় আরো বেশী অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এবং বর্তমান যেসব অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে তা প্রয়োগে বিশেষভাবে সতর্ক হ'তে হবে বলে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ছোটখাটো অসুখে অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার প্রয়োগের ফলে মারাত্মক অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা অনেকখানি কমে যায়। ফলে আগে সাধারণ অসুখে আরোগ্য হ'ত এমন সব রোগে এখন মানুষ মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শিশুরা। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে এখনই সতর্ক না হ'লে কোভিড মহামারির অবসানের পর এটাই বিশ্বব্যাপী এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তাদের মতে যেসব কারণে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট হয়ে থাকে, এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল- (১) বিনা প্রেসক্রিপশনে ঘনঘন অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা (২) পুরো কোর্স শেষ না করে মাঝপথে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বন্ধ করা (৩) প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া (৪) ভাইরাসজনিত কোন অসুখে, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে এমনি সেরে যেত, সেখানে বিশেষ করে শিশুদের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া।

ধাকাস্থ আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান যাকির হোসাইন হাবীব বলেন, অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে অনেক ওষুধই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর হয়ে পড়ছে।

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

সাক্ষাতের সময়

সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)।

বি.দ্র. কুরিয়ার যোগে ঔষধ পাঠানো হয়

যোগাযোগ

ডা. মুহাম্মাদ মুনজুরুল হক (ডি.এইচ.এম.এস)
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৭১১-৪১৫৪৯৯।

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)
(A trusted home with a family touch)

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100.
Phone : 880-721-771100, 771200
Mobile : 01711-302322.
Email: admin@hotelmukta.com.bd
website: hotelmukta.com.bd

তাবলীগী ইজতেমা ২০২১ সফল হৌক

মুসলিম জাহান

দৃষ্টিহীন লেবাননী সাজিদার কুরআন হিফয

লেবাননের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তরুণী সাজিদা বেলাল আব্দুর রহমান। কিন্তু কুরআন হিফয করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতা তার জন্য বাধা হয়ে থাকেনি। এই বাধা অতিক্রম করেই কুরআন হিফয করেছেন তিনি। সাজিদা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে হিফয সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। ব্রেইল বর্ণমালার পবিত্র কুরআনের সহায়তায় আমি হাফেযা হয়েছি। আমি সারা দিন কুরআন পড়তাম। মুখস্থ হ'লে পরিবারের লোকজনকে শোনাতাম।

অনুষ্ঠানে সাজিদার পিতা-মাতারও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। মেয়ে হাফেযা হওয়ায় নিজেদের গর্বের কথা জানান তারা। এসময় তার পিতা বিশ্বের সকল পিতা-মাতাকে অনুরোধ করেন, তারা যেন তাদের সন্তানদের মোবাইল, টিভি ও ইন্টারনেটে অযথা সময় ব্যয় করা থেকে বিরত রেখে কুরআন শিক্ষা দেন এবং মুখস্থ করান।

রিয়াদে বালুঝড়ে পণ্ড হ'ল কে পপ কনসার্ট

সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে ভারী বৃষ্টিপাত ও বালুঝড়ের কারণে শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়েছে একটি কে পপ কনসার্ট। গত ১৪ই জানুয়ারী উন্মুক্ত স্থানে আয়োজিত অনেকগুলো ইভেন্ট বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। আরব নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় কে পপ কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তাতে সঙ্গীত পরিবেশনের কথা ছিল কে পপ ব্যান্ড স্ট্রে কিডস এবং দক্ষিণ কোরীয় গায়ক চুংহার। তাদের গান শুনতে বিক্রি হয়ে যায় সবগুলো টিকেটও। কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকেই শহরজুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘণ্টায় ৩১ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়।

কনসার্টের আয়োজক জেনারেল এন্টারটেইনমেন্টের সিইও এবং রিয়াদ সিজনের চেয়ারম্যান তুর্কী আল-শেখ জানিয়েছেন, রিয়াদের আবহাওয়ার কারণেই ইভেন্টগুলো স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।

১৯ কোটি বছর আগের পাথরে লেখা 'বিসমিল্লাহ'!

তুরস্কের ভূমধ্যসাগরীয় প্রদেশ আন্টালিয়ায় মার্বেল কোয়ারিতে পাওয়া একটি মার্বেল পাথরের ওপর আরবী অক্ষরে 'বিসমিল্লাহ' শব্দ পাওয়া গেছে। পাথরটি ১৯ কোটি ৫০ বছর আগের বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ ঐ সময় বসবাসকারী সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবাশ্মের 'বায়োক্লাস্টিক' এই ডলোমিটিক চুনাপাথরে পাওয়া গেছে, যা দিয়ে পাথরের স্লাবটি গঠিত হয়েছিল। আন্টালিয়া কোরকুটেলি যেলার তাসকেসিগি গ্রামে আন্টালিয়া মার্বেল ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেড কোম্পানির ব্যবসায়িক এলাকায় এই আবিষ্কারটি করা হয়। পাথরের ওপর যে চিত্রটি ফুটে ছিল তাতে খনি শ্রমিকদের সেদিকে দৃষ্টি পড়ে। তারপর পাথর থেকে ধুলো সরিয়ে তারা দেখেন সেখানে আরবী অক্ষরে 'বিসমিল্লাহ' লেখা আছে। তারপর সেটি বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হ'লে বিজ্ঞানী ফুজুলি ইয়াগমুরলু, রাসিত আলটিন্দাগ এবং নাজমি সেনগুন তাদের বিশ্লেষণে উক্ত বিষয়টি আবিষ্কার করেন।

[কুরআন বলেছে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর গুণগান করে। অতএব এতে মুসলমানদের কাছে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু অবিশ্বাসীরা এ থেকে উপদেশ নিয়ে ইসলাম কবুল করবেন, এটাই কাম্য (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্ষতস্থান থেকেই উৎপন্ন হবে শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ!

দুর্ঘটনায় অনেক সময় মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক সময় সংক্রমণ থেকে বাঁচাতেও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় কোনও কোনও অঙ্গ। তবে এবার এই বিষয়ে গবেষণায় এল এক যুগান্তকারী সাফল্য। আগামীতে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নতুনভাবে তৈরি হবে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ। সম্প্রতি আমেরিকার ইউএফটিএস এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দাবী অনুযায়ী তারা তৈরি করেছেন এক বিশেষ মলম, যা মানুষের শরীরের বাদ যাওয়া অংশের কাছে লাগিয়ে দিলেই নতুন করে গঠিত হবে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ। ইতিমধ্যেই এই পরীক্ষাটি তারা একটি আফ্রিকান স্ত্রী ব্যাঙের ওপর করেছেন এবং সাফল্যও পেয়েছেন। তারা প্রথমে ঐ ব্যাঙটির পা কেটে বাদ দেন এবং ঐ কাটা অংশে তাদের তৈরি মলমের প্রলেপ লাগিয়ে দেন। এর পর তারা লক্ষ্য করেন ঐ ব্যাঙটির ক্ষত সম্পূর্ণ রূপে সেরে উঠেছে এবং কাটা পায়ের অংশ থেকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় নতুন করে পা গজাতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, নতুন করে মানুষের অঙ্গ উৎপত্তির এই বিশেষ ধারণা তারা পেয়েছেন টিকটিকি থেকে। কারণ টিকটিকির লেজ মাঝে মধ্যেই কেটে পড়ে যায়। ফের ঐ টিকটিকির শরীরে নতুন করে লেজ কিভাবে তৈরি হয়, এই কৌতূহল থেকেই এই গবেষণাটি চালিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তারা এই চিকিৎসা পদ্ধতিটির নাম রেখেছেন 'লিম্ব টু গ্রো' অর্থাৎ কাটা অংশের বৃদ্ধি। এই মলমটি মানুষের শরীরেও বিশেষভাবে কার্যকর হবে বলে জানান তারা।

[টিকটিকির লেজ সবসময় খসছে ও গজাচ্ছে। কিন্তু এতদিন কারো নযরে পড়েনি। এতেই রয়েছে আল্লাহর কুদরত। তিনি তার বান্দাদের মাধ্যমে এমনি করেই বান্দার কল্যাণ করে থাকেন। আমরা গবেষকদের ধন্যবাদ জানাই ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি (স.স.)]

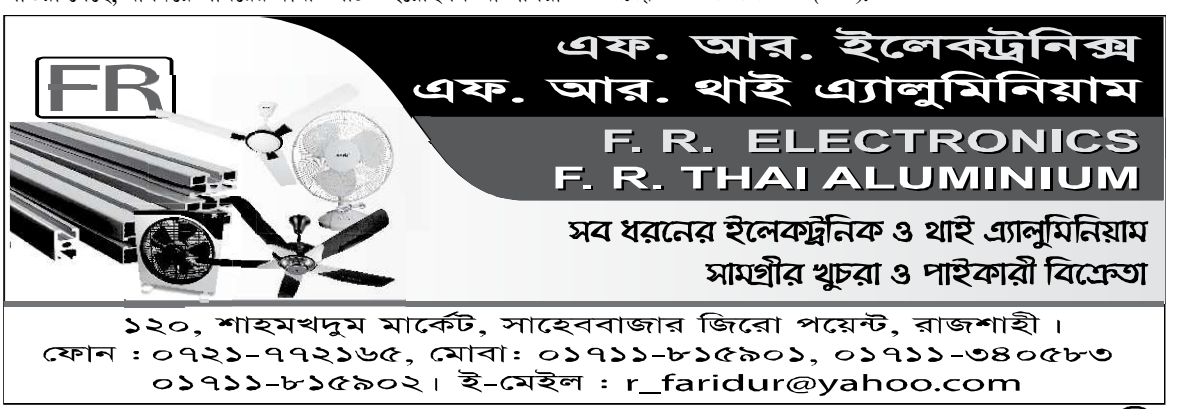

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

১৮ই ডিসেম্বর'২১-য়ে অনুষ্ঠিত রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সম্মেলনের অবশিষ্ট রিপোর্ট

যেলা সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শহরের সেন্ট্রাল রোডস্থ সালাফিইয়াহ জামে মসজিদে জামা'আতের সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত মুছল্লী, মসজিদ সংলগ্ন জামে'আ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও ছাত্রদের উদ্যেশ্যে নছীহত মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে যে কোন মূল্যে আহলেহাদীছের মূল আদর্শের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলো জ্বালতে হবে। অবশ্যই আমাদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। নইলে আমাদেরকে বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যেতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে 'জমঈয়তে'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উপলক্ষে অত্র মসজিদে তাঁর প্রথম আগমনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ঢুকেই দেখি পশ্চিম দিকের দেওয়ালের উপর দিকে বড় বড় দুই ওয়ালমেটে আরবীতে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা শোভা পাচ্ছে। তখন আমি মুওয়াযযিনকে ডেকে বললাম, এ দু'টি নামান। তিনি বললেন, সেক্রেটারীর অনুমতি লাগবে। তিনি বললেন, কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। এখুনি নামান'। তখন বড় টুলে উঠে মুওয়াযযিন ওদু'টি নামিয়ে নিল। যোহরের সময় সেক্রেটারী এলে তার প্রশ্নের উত্তরে মুওয়াযযিন আমার নাম করলে তিনি আর কিছু বলেননি। ২০১৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী শুক্রবার সকালে অত্র মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করলে ঐ মুওয়াযযিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। উল্লেখ্য যে, জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী, প্রধান মুফতী মাওলানা আলীমুদ্দীন সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম উক্ত প্রশিক্ষণ উপলক্ষে আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমীরে জামা'আতের বক্তব্যে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুল হকসহ মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, মুওয়াযযিন সহ উপস্থিত সুধী মণ্ডলী খুবই খুশী হন এবং তাঁর সাথে মুছাফাহা ও কুশলাদি বিনিময় করেন। পরবর্তীতে উভয় কমিটির দায়িত্বশীলগণ 'আন্দোলন'-এর সভাপতির সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, যদি উনি সেদিন ওটা না নামাতেন, তাহ'লে আজও ওটা ওখানেই থেকে যেত'।

মসজিদের উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফী সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ।

মাসিক ইজতেমা

রংপুর ৭ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মুসলিম পাড়া শেখ জামাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান। উল্লেখ্য, একই দিন কেন্দ্রীয় মেহমান ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

তেঘরমাড়িয়া, মোহনপুর, রাজশাহী ১৭ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন তেঘরমাড়িয়া-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জাহানাবাদ এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম।

কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২১শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কানসাটে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী। উল্লেখ্য, একই দিন কেন্দ্রীয় মেহমান চর মোহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মাধবপুর-মধ্যপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা উপযেলাধীন মাধবপুর-মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক ও বড়গাছী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মুত্তালিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আহমাদুল্লাহ।

লক্ষ্মীপুর চৌরাস্তা, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ ২৯শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কোটচাঁদপুর থানাধীন লক্ষ্মীপুর চৌরাস্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুসাইন কবীর।

ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ

মাগরিব যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন ঝিনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস'-এর ম্যানেজার মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ।

টিকইল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন টিকইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল বারী।

বাজারঘাটা, কক্সবাজার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের বাজারঘাটাস্থ হাফেয আহমাদ চৌধুরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

কর্মী সমাবেশ

ভোলাচং, নবীনগর, বি-বাড়িয়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নবীনগর থানাধীন ভোলাচং মুহাম্মাদিয়া আরাবিইয়াহ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' বি-বাড়িয়া যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক আতাউল্লাহ বিন জামশেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বি-বাড়িয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও ঢাকা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা সাঈদুর রহমান, যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য তাজুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশ শেষে নবীনগর পৌরসভা 'আন্দোলন'-এর কমিটি ও মহিলা সংস্থার কমিটি এবং জিনদপুর এলাকা ও রতনপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসাইন পারভেয। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় মেহমান ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন অত্র মসজিদে ও ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব নবীনগর থানাধীন জিনদপুর জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ

বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১৯শে ডিসেম্বর'২১ রবিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে যেলার হরিপুর থানাধীন বনগাঁও ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

মহাদেবপুর, নওগাঁ ২১শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন মহাদেবপুর কলেজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইব্রাহীম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মামূনুর রশীদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাকীম।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নীলফামারী-পশ্চিম ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার সদর থানাধীন পলাশবাড়ী, রামগঞ্জ, চড়াইখোলা ও খোকসাবাড়ীতে শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ২০০টি চাদর এবং যেলার নিজ উদ্যোগ ৪০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ, অর্থ সম্পাদক ফযলুল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রশীদুল ইসলাম প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টা হ'তে পরপর তিনদিন কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার সদর থানাধীন চর যাত্রাপুর, রৌমারী থানাধীন চরঘুঘুমারী, উলিপুর থানাধীন বেগমগঞ্জ ও রাজারহাট থানাধীন সরিষাবাড়ীতে শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ২৫০টি চাদর বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, অর্থ সম্পাদক আশরাফ আলী ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান প্রমুখ।

রাজশাহী ১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে গত ১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ফজরের আযানের সময় থেকে নগরীর নওদাপাড়া, ভাঁড়ালীপাড়া, ছোটবনগ্রাম, চকপাড়া, ভদ্রা, রেলস্টেশন, রেলগেটসহ বিভিন্ন বস্তি এলাকায় শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ২০০টি চাদর বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ও আত-তাহরীক টিভির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ফায়ছাল মাহমূদ, প্রশিক্ষণ

সম্পাদক মুহাম্মাদ রাসেল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর আইটি সহকারী আবুল বাশার ও মুহাম্মাদ রেযওয়ান প্রমুখ।

পঞ্চগড় ২৪শে জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার সদর থানাধীন হাড়িভাসা, টুনিরহাট, খাসমহল, খানপুকুর, খোলাপাড়া ও বোদা উপযেলাধীন মৌলভীপাড়া, ফুলতলা, সাহেবপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়ায় শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছাদেকুল বারেক, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম প্রধান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম প্রধান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ইব্রাহীম প্রধান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোযাহার আলী ও সাধারণ সম্পাদক রশীদুল ইসলাম প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম-উত্তর ১লা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার ভুরুঙ্গামারী উপযেলাধীন বলদিয়া ও চরধাউড়ারকুটির বিভিন্ন এলাকায় শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ৩৭টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসাইন প্রমুখ।

নীলফামারী-পূর্ব ২রা ফেব্রুয়ারী বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় নীলফামারী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার জলঢাকা উপযেলার পূর্ব বালাগ্রাম -কাশিনাথপুরের বিভিন্ন এলাকায় শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা আমানাতুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক ডা. সাঈদুর রহমান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুকীমুদ্দীন, যুববিষয়ক সম্পাদক মোকছেদ আলী, দফতর সম্পাদক যিয়াউর, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও ১০ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য রাত ৯-টায় ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার হরিপুর উপযেলাধীন হরিপুর বাজার, বনগাঁও, চৌরঙ্গী ও রাণী শংকৈল উপযেলাধীন ধিহট, রাউটনগর ও নলতৈড়ে শীতার্ত গরীব-অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে ১০৯টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফারূক প্রমুখ।

সোনামণি

প্রশিক্ষণ

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৩রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আলহেরা আহলেহাদীছ মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক নাজমুল হক ও অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক ফিরোয কবীর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ সীজান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ সোহান।

মহিলা সংস্থা

মহিলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

গাংনী, মেহেরপুর ২৪শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে আছর পর্যন্ত যেলার গাংনী থানাধীন গাংনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'মহিলা সংস্থা'-এর সভানেত্রী আনজুমান আরা সুলতানার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে 'ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাংনী থানা 'মহিলা সংস্থা'-এর সভানেত্রী অধ্যাপিকা রোজিনা আফরোয, 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুজীবনগর থানার সভানেত্রী শারমিন আখতার ও 'আন্দোলন'-এর চার দফা কর্মসূচী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাংনী শাখার সভানেত্রী সোনিয়া সুলতানা। উক্ত সমাবেশে দুই শতাধিক মহিলা সুধী ও দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে ২দিন ব্যাপী 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৯-টায় শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম।

অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম (একজন সফল শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য), মারকাযের হিফয বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমান (বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি), মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠদান পদ্ধতি), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রাজশাহী-এর সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ মণ্ডল (শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়ন ও আবাসিক ব্যবস্থাপনা), বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বাউয়েট)-এর রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ মঈনুল ইসলাম (শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও কাউন্সেলিং), ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-এর আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক এবং ইন-চার্জ জুনায়েদ মুনীর (কো-অপারেটিভ লার্নিং

বা পরস্পর সহযোগিতামূলক জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আচরণবিধি), হাদীছ ফাউণ্ডেশন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম (প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব-কর্তব্য), সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস (সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম) প্রমুখ। প্রশিক্ষণে প্রায় ৪৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০৬ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীসহ ৭ জনকে বিশেষ পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করা হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম (দিনাজপুর), ২য় স্থান অধিকার করেন মাদ্রাসা বায়তুল 'ইলম-এর পরিচালক রায়হানুল ইসলাম (দিনাজপুর) ও ৩য় স্থান অধিকার করেন মাদ্রাসাতুল ইছলাহ আস-সালাফিইয়াহ-এর শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)। সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন। সর্বশেষে 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর বই বিক্রয় বিভাগের সাবেক ম্যানেজার হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (৫৬) কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৬শে জানুয়ারী বুধবার বিকাল ৩-টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়ালাসিস চলা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযায় 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং মারকাযের ছাত্রগণ সহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর রাতেই তার লাশ এ্যাম্বুলেন্স যোগে তার নিজ যেলা নরসিংদীর সদর থানাধীন পাঁচদোনার নিকটবর্তী চৈতাব গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরদিন সকাল ১০-টায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে চৈতাব আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও তার ভায়রা-ভাই ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সেখানকার জানাযায় 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুদ্দীন ভূঁইয়া, অর্থ সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুয্যামান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ খানসহ নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

(২) মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (৮৫) গত ২৯শে জানুয়ারী শনিবার বাদ ফজর বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র এবং ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর নিজ গ্রাম গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন পোগইল দারুলহুদা ইসলামিয়া মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বহু মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(৩) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর দীর্ঘ ২৭ বছরের শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম (৫৮) গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবাগত রাত ২-টা ৪০মিনিটে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বেলা পৌনে ১২-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযায় 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে রাজশাহী মহানগরীর এয়ারপোর্ট থানাধীন বায়া-ভোলাবাড়ী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, ক্বওমী, আলিয়া মাদ্রাসার কিতাব ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

বিঃদ্রঃ দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, আম চত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ সফল হোক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর সিলেবাস দ্বারা পরিচালিত

হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলা হাফেযিয়া মাদ্রাসা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার
মক্তব, নাজেরা, হিফয ও জেনারেল
(বাংলা, ইংরেজী, গণিত)

বৈশিষ্ট্য

- ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা।
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা দ্বারা শিক্ষা দান।
- আবাসিক ছাত্রীদের জন্য মানসম্মত খাবার ব্যবস্থা।
- উন্নত আবাসিক ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : ৫৯৬ মহিষবাথান উত্তরপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৭-৬২২৯০৪।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে যুক্ত হয়ে ঢাবি শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা সেবা চালু করেছে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যবীমায় প্রতি বছর ২৭০ টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক। বিনিময়ে সকল শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ও মেডিক্যাল ব্যয়ভার বহন করবে প্রতিষ্ঠানটি। এ অর্থ গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি ব্যবসায়িক ইন্স্যুরেন্স-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যবসায়িক ইন্স্যুরেন্স ইসলামী শরী'আত সম্মত নয়। কারণ- (১) ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে সূদ বিদ্যমান। এতে জমা টাকার বিনিময়ে অধিক টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। (২) ইন্স্যুরেন্স জুয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এতে হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লাভবান হয়, অথবা জমাকারী লাভবান হয়। তবে কোম্পানী লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। ফলে কোন এক পক্ষ একচেটিয়াভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৩) ইন্স্যুরেন্সের ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে আহত ব্যক্তি নিরাপত্তা বাবদ টাকা পাবেন। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে, আবার নাও পারে। আবার দুর্ঘটনা কখন ঘটবে ও কি পরিমাণে ঘটবে, তা সবই অজ্ঞাত। ফলে এর মধ্যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। আর এমন অস্পষ্ট ও ধোঁকাবাজির ব্যবসা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩ প্রভৃতি)*। সুতরাং উক্ত ইন্স্যুরেন্স পলিসির সাথে স্বেচ্ছায় যুক্ত হওয়া যাবে না। বরং সাধ্যমত বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়া পরস্পরকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সমিতি গড়ে তোলা জায়েয, যেখান থেকে সমিতির সদস্যরা বিপদগ্রস্ত সদস্যকে সহযোগিতা প্রদান করতে পারবে *(আল-মা'আজিরুশ শারঈয়াহ ৩৭২-৩৭৩ পৃ.; নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : ভাইরাসে আক্রান্ত এমন পশু যার মালিক জানে যে তার পশুটি মারা যেতে পারে এমন পশু অন্যের নিকট বিক্রি করার বিধান কি?

-মা'রেফাত, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এমন পশুর সমস্যা গোপন রেখে বিক্রয় করা যাবে না। বরং পশুটির অসুস্থতার কথা স্পষ্টভাবে ক্রেতাকে জানাবে। জেনেশুনে ক্রয় করলে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও (ত্রুটি) গোপন করে, তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে *(বুখারী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/২৮০২)*। এছাড়া পশুর দোষ গোপন করে বিক্রয় করা প্রতারণা। আর ইসলামে প্রতারণা হারাম *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। পক্ষান্তরে উভয়ে যদি প্রতারণায় একমত হয়ে লেনদেন করে, তাহলে সেটি নিষিদ্ধ হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : শীত থেকে বাঁচতে টাখনুর নিচে পায়জামা পরা যাবে কি?

-তাওহীদ হাসান, রংপুর মেডিকেল কলেজ।

উত্তর : সর্বাবস্থায় টাখনুর উপর কাপড় পরতে হবে। কারণ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। বরং শীত নিবারণের জন্য লম্বা মোযা পরিধান করবে *(তিরমিযী হা/২৮২০; মিশকাত হা/৪৪১৮)*। অহংকারবশে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গোনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন টাখনুর নীচে কাপড় যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। তিনি বলেন, লুঙ্গি বা পায়জামার পায়ের গোছা স্পর্শ করার কোন অধিকার নেই *(তিরমিযী হা/১৭৮৩)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : ইমাম ছাহেব সবসময় বলেন, প্রত্যেক মুছল্লীর পিছনে ৭৩ জন শয়তান লাগানো থাকে। একথার সত্যতা আছে কি?

-ইমরান হাসান জিহাদ, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর: উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে শয়তান মানুষের সাথে সর্বক্ষণ অবস্থান করে এবং ওয়াসওয়াসা প্রদান করে *(মুসলিম হা/২৮১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শয়তান মানুষের রক্তনালীর মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ)*। সাধারণভাবে 'খিনযাব' নামক শয়তানরা সর্বদা মুছল্লীর মনে ওয়াসওয়াসা দিয়ে তাকে মনভোলা করে দেয় এবং রাক'আত সংখ্যায় ভুল করায় *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*। এছাড়া ছালাতের কাতারে দু'জনের মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকলে সেখানে শয়তান দাঁড়িয়ে ওয়াসওয়াসা দেয় *(আহমাদ হা/২২৩১৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪৯১)*। অতএব শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে কুরআন ও হাদীছের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : আল্লাহর সত্তা ও আল্লাহর চেহারা বলতে কি বুঝায়? এগুলো কি সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়?

-রণি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।*

*[*আরবীতে সঠিক ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : আল্লাহর গুণাবলী দু'ভাবে বিভক্ত। (১) সত্তাগত গুণাবলী। যেমন তাঁর চেহারা, হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ– 'কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী' *(রহমান ৫৫/২৭)*। এখানে

চেহারাকে আল্লাহ্র সত্তাগত গুণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে কারণেই 'যুল জালালে' বলা হয়েছে। নইলে 'যিল জালালে' বলা হ'ত। তিনি বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ، 'সবকিছুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। (২) কর্মগত গুণ। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা' *(যুমার ৩৯/৬২)*। এর মধ্যে আল্লাহ্র সৃষ্টিগুণ বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র সত্তা হ'ল আদি। তাঁর পূর্বে কিছুই ছিলনা। পরে তিনি পানি সৃষ্টি করেন এবং আরশ সৃষ্টি করেন, যা পানির উপরে ছিল' *(বায়হাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ ২৯-৩১ পৃ.; মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/১৭৯-১৮০)*। সত্তাগত ও কর্মগত গুণ সমূহ যখন আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধিত হয়, তখন সেটি আল্লাহ্র সত্তা হিসাবে গণ্য হয়। পৃথক কোন সৃষ্টি হিসাবে নয়। যদিও বাহ্যতঃ এগুলি পৃথক। যেমন মসজিদে প্রবেশের সময় রাসূল (ছাঃ) বলতেন, أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، 'আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহ্র নিকটে এবং তাঁর সম্মানিত চেহারার মাধ্যমে' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯)*। এখানে তাঁর চেহারা ও ক্ষমতাকে পৃথকভাবে বলা হ'লেও তার অর্থ আল্লাহ্র সত্তা। সেটি পৃথক কোন মাখলূক নয়, যেমন আল্লাহ্র কালামও মাখলূক নয়। যেটি বলে থাকেন নির্গুণবাদী জাহমিয়া, মু'আত্ত্বিলাহ, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকার লোকেরা। ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহকে তাঁর নিজস্ব চেহারায় দেখতে পাবেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৫৫৫)*। কিন্তু অবিশ্বাসীগণ ও কপটবিশ্বাসীগণ তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'আল্লাহকে দর্শন' বই)*।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করতে হবে কোনরূপ পরিবর্তন, সামঞ্জস্যকরণ, শূন্যকরণ, প্রকৃতি নির্ধারণ, তুলনাকরণ বা আল্লাহ্র উপরে ন্যস্তকরণ ছাড়াই। আল্লাহ্র নিজস্ব আকার আছে, যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। আয়াতটি 'তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাতে'র অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব প্রমাণিত হয়। যা অনন্য ও অতুলনীয়।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন' মর্মে বর্ণিত দো'আটি পাঠের ফযীলত কি? এটি পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দো'আ হিসাবে পাঠ করা যাবে কি?

-সুমাইয়া, রাজশাহী।

উত্তর : দো'আ ইউনুস দ্বারা ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। কারণ দো'আ দুই প্রকার-প্রশংসা মূলক ও প্রার্থনা মূলক। আর দো'আ ইউনুসের মধ্যে দু'টোই রয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/২৪৪)*। যেমন আল্লাহ বলেন, অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল, لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘন কারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইউনুস (আঃ) এই দো'আ মাছের পেটে পড়েছিলেন। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পড়লে আল্লাহ তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২)*। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোন কষ্ট বা মুছীবতে নিপতিত হবে, অতঃপর দো'আ ইউনুস পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দিবেন' *(হাকেম হা/১৮৬৪; ছহীহাহ হা/১৭৪৪)*। উল্লেখ্য যে, এক লক্ষ বার দো'আ ইউনুস পাঠ করলে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় মর্মে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং পরিবারের বড় মেয়ে। আমাদের কোন ভাই নেই। পিতার চাকুরী ১ বছরের মধ্যে শেষ হবে। আমাদের আর কোন ইনকামের সোর্স নেই। পিতা আমার পড়াশুনার পিছনে অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন এ আশায় যে আমি চাকুরী করে সংসারের হাল ধরব। অধ্যয়নরত অবস্থায় পিতা আমার বিবাহ দেন এবং আমার সন্তান হয়। এখন পিতা-মাতা চান আমি সন্তানকে তাদের কাছে রেখে ৩০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা শেষ করি এবং চাকুরী করি। কিন্তু স্বামী চান তার কাছে থেকে সন্তানের দেখাশুনা করি। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রংপুর।

উত্তর : বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং যথাসম্ভব পিতা-মাতাকে সাহায্য করবে। কারণ ইসলামী শরী'আতে স্বামীর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে *(আহমাদ হা/১৯০২৫; ছহীহাহ হা/২৬১২)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বিবাহিতা নারীর জন্য স্বামীই আনুগত্যের অধিক হকদার পিতা-মাতার চাইতে। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে যেতে পারবে না। এ ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩; হায়তামী, আল-ফাতাওয়াল ফিক্বহিয়াল কুবরা ৪/২০৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/২৯৫; মারদাভী, আল-ইনছাফ ৮/৩৬২; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮২ পৃ.)*। তবে পিতা বা স্বামী যেকেউ স্ত্রীকে বেপর্দা বা শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে তা মানা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫)*। এমতাবস্থায় স্বামীর সাথে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, বাড়াবাড়ি করবে না এবং যথাসম্ভব পিতা-মাতাকেও সাহায্য করবে।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : আমরা দুই ভাই আট বোন। আমার পিতার সাড়ে ষোল বিঘা জমি ছিল। এর মধ্যে আমাকে সাত বিঘা, আমার ভাইকে সাড়ে পাঁচ বিঘা ও ৮ বোনকে চার বিঘা জমি দিয়েছিলেন। এখন আমরা দুই ভাই, বোনদেরকে আরো ৩২ কাঠা জমি প্রদান করেছি। এতে তারা খুশি হয়ে যাবতীয়

দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার পিতা দায়মুক্ত হবেন কি?

-আব্দুস সাত্তার, বাথানপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রথমতঃ পিতা মীরাছ বণ্টন যথাযথভাবে না করায় এবং মেয়েদের হক নষ্ট করায় গোনাহগার হয়েছেন। এক্ষণে বোনেরা যদি খুশি হয়ে প্রাপ্য দাবী ত্যাগ করেন বা কম-বেশীতে রাযী থাকেন, তবেই পিতা দায়মুক্ত হবেন। কারণ ভাই-বোনদের পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও সমঝোতার মাধ্যমে মীরাছে কমবেশী করা যেতে পারে *(নিসা ৪/২৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/২০৭, ২৩৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর যদি কেউ অছিয়তকারীর পক্ষ হ'তে পক্ষপাতিত্বের বা গোনাহের আশংকা করে এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(বাক্বারাহ ২/১৮২)*। কন্যা বা বোনেরা অনেক সময় চাপের মুখে অথবা লৌকিকতার খাতিরে চুপ থাকে বা মেনে নেয়। এটির নাম মীমাংসা নয়। বরং তাদের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও সমঝোতা থাকতে হবে। তাদের বঞ্চিত করার জন্য কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। কারণ মীরাছ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা কবীরা গোনাহ *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/৩০৬; বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২০/২২১)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : হোমিও চিকিৎসায় ঔষধ দেওয়ার পর এর কার্যকারিতার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু ঔষধ শেষ না হ'তেই রোগীরা ঔষধ নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। এমতাবস্থায় তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পানিতে বা গ্লোবিউল্‌সে কয়েক ফোঁটা স্পিরিট মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং এতে ঔষধের মূল্যও নেওয়া হয়। এভাবে ঔষধ দেওয়া যাবে কি?

-মুছত্বফা, নওগাঁ।

উত্তর : এতে কোন সমস্যা নেই। কারণ এটি মূলতঃ প্রতারণা নয়। বরং রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া। এমতাবস্থায় প্রয়োজনবোধে রোগীকে ঔষধের কার্যকারিতা বিলম্বের সঠিক কারণ জানাবে।

প্রশ্ন (১০/২১০) : বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন শায়েখের ভক্তরা অন্য শায়েখদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে, বিদ'আতী ও কাফের বলে ফৎওয়া দেয় এবং নানা গালিগালাজ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যে লিপ্ত হয়। এসব করা কতটুকু জায়েয? এসবের পরিণতি কি?

-আমীনুর রহমান, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : এ ধরনের অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমালোচনা গীবত হিসাবে গণ্য হবে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, 'আমার উম্মতের অধিকাংশ মানুষ তার যবানের কারণে জাহান্নামে যাবে' *(তিরমিযী হা/২০০৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৭২৩)*। তবে স্রেফ ইছলাহের উদ্দেশ্যে ও নেকীর আশায় জনকল্যাণার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়। যেটা আসলে গীবত নয়। বরং সত্য তুলে ধরা। যেমন (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাইয়ের জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করার জন্য (৫) পাপাচার ও বিদ'আত থেকে সাবধান করার জন্য (৬) প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭৫; মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : জনৈক ব্যক্তি চার কন্যা, এক ছেলে ও মৃত ছেলের এক কন্যা (পৌত্রী) রেখে মারা গেছেন। এক্ষণে ছেলে-মেয়ের উপস্থিতিতে পৌত্রী দাদার সম্পত্তিতে মীরাছ পাবে কি?

-নাদিরা বেগম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মৃতের ছেলে ও মেয়ে জীবিত থাকায় পৌত্রী কোন সম্পত্তি পাবে না। কারণ মৃতের নিকটতম আত্মীয় ছেলে ও মেয়েরা জীবিত আছেন। তবে দাদা ও চাচাদের উচিৎ ইয়াতীম মেয়েটির জন্য কিছু সম্পত্তি অছিয়ত করা বা পিতা জীবিত থাকলে যে পরিমাণ সম্পত্তি পেত সে পরিমাণ সম্পত্তি তার জন্য হেবা করা *(বাক্বারাহ ২/১৮০; উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন ২/৩০৬-৭; বিন বায, ফাতাওয়াল জামে'ইল কবীর)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : একটি পারিবারিক কবরস্থান ছিল যেখানে প্রথম ৪০ বছর পূর্বে এবং সর্বশেষ ১০ বছর পূর্বে লাশ দাফন করা হয়। বর্তমানে ঐ পরিবারের সদস্যরা সরকারী কবরস্থানে লাশ দাফন করে। আর তারা পারিবারিক কবরস্থানটিকে ড্রেজার দিয়ে ভেঙ্গে পরিষ্কার করেছে। তারা জায়গাটিতে চাষাবাদ করবে বা বিক্রয় করে দিবে। এক্ষণে লাশের সাথে এমন আচরণ করা সমীচীন হয়েছে কী?

-নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : লাশের সাথে এমন অসম্মানজনক আচরণ করা গর্হিত অপরাধ। শারঈ কারণ ব্যতীত কবর খনন করে লাশ উঠানো বা কবর স্থানান্তর করা জায়েয নয়। এতে লাশের প্রতি অসম্মান করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার সমান *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ হা/৩২০৭; মিশকাত হা/১৭১৪)*। লাশ বহনকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা লাশ উঠাবে তখন ধাক্কাধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া করো না; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে' *(বুখারী হা/৫০৬৭; মিশকাত হা/৩২৩৭)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এতে বুঝা যায় যে, মুমিনের সম্মান মৃত্যুর পরেও অবশিষ্ট থাকে যেমন জীবিত অবস্থায় ছিল' *(ফাৎহুল বারী ৯/১১৩)*। সুতরাং কবরস্থান ধ্বংস করে দিয়ে তথায় চাষাবাদ করা কিংবা তা বিক্রয় করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : আমার কোম্পানীতে প্রতিদিন যে কাজ তা মাঝে মাঝে দ্রুত শেষ করে আমি অন্যদের সাথে গল্প বা মোবাইল ব্যবহার করে অনেক সময় অপচয় করি। এসময় চাইলে অন্য কাজ করা যায়। কিন্তু আমার সিনিয়র আরেকজন বসে থাকায় আমি করি না। বেশী কাজ করলে সহকর্মীরাও রাগ করে। এক্ষণে আমার এই অফিস টাইম নষ্ট করা কাজে ফাঁকি হিসাবে গণ্য হবে?

-মাহফূযুর রহমান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : যেকোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি নিয়োগদাতার সাথে চুক্তি অনুযায়ী যথাযথভাবে দায়িত্বপালন না করে ফাঁকি দিলে গুনাহগার হবে। কারণ চাকুরীরত ব্যক্তি নিয়োগকারীর সাথে

নির্দিষ্ট শর্তাধীনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কর্মরত হয়েছেন। যা একটি আমানত। এর খেয়ানত করলে কবীরা গুনাহ হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার আমানতদারী নেই তার দ্বীন নেই *(আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৯)*। তিনি বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তবে নিজ দায়িত্ব পালনের পর ইনছাফ ও দায়বদ্ধতা বজায় রেখে ন্যায়পরায়ণতার সাথে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সময় অন্যত্র ব্যয় করায় দোষ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৯, ১৯/৩৫৩-৩৫৪)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : বক্সে বা কফিনে লাশ রাখা অবস্থায় দাফন করা যাবে কী?

-আব্দুল্লাহ আল-মেরাজ, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : বিনা ওযরে কফিন বক্সে রেখে দাফন করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের আমলে এমন পদ্ধতি চালু ছিল না। বরং কবরের সাধারণ মাটিতে রেখে লাশ দাফন করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩১২)*। এক্ষণে লাশ যদি পুড়ে যায় বা বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশংকা থাকে বা গলে যায়, আর তা স্বাভাবিকভাবে বহন করা না যায় তাহ'লে কফিনে রাখা অবস্থায় দাফন করা যাবে। অনুরূপভাবে মাটি যদি কবরের জন্য অনুপযোগী হয় বা ভেঙ্গে পড়ে যায় তাহ'লে কফিনে রেখে দাফন করা যায় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৭৬; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৫৪৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২/১১৯)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : আমি একটি কোম্পানীর সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরী করি। কোম্পানী আমাকে এফডিসিতে একটি সিনেমার কাজের জন্য নির্মিতব্য ভবন সম্পন্নের দায়িত্ব দিয়েছে। এখানে কাজ করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ প্রিন্স, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত কাজ করা জায়েয হবে না। কারণ এতে গুনাহের কাজে সহায়তা করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও অন্যায়ের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। এক্ষণে যদি কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কাজে বাধ্য করে, তবে বিকল্প কর্ম অন্বেষণ করবে। আল্লাহ বলেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত আদায়ের সময় ২ রাক'আতে পঠিতব্য আত্তাহিইয়াতু পাঠ করতে ভুলে গেলে করণীয় কি? উক্ত ২ রাক'আত আবার পড়তে হবে না সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে?

-মুহাম্মাদ আকাশ, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : ছালাতের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজিব। এক্ষণে কেউ যদি তাশাহহুদ পাঠ করতে ভুলে যায় তাহ'লে শেষ বৈঠকে দু'টি সহো সিজদাহ দিয়ে সালাম ফিরাবে। এজন্য পুরো ছালাত আদায় করতে হবে না *(বুখারী হা/৮২৯; মিশকাত হা/১০১৮; ইবনু কুদামাহ, আল-কাফী ১/২৭৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/৩৯৩)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : সারাজীবন হারাম উপার্জন করে বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা কামানোর পর যদি কেউ অনুতপ্ত হয়ে হালাল পথে ফিরে আসে তবে তার পূর্বে অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে করণীয় কি?

-জুয়েল বিন ইদ্রীস, মুজিবনগর, মেহেরপুর।*

*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : প্রথমতঃ যদি অজ্ঞতার কারণে হারাম পন্থায় উপার্জন করে থাকে এবং সঠিক বিধান জানার সঙ্গে সঙ্গে হারাম থেকে বিরত হয় তাহ'লে পূর্বের উপার্জিত সম্পদ তার জন্য ভোগ করা জায়েয *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৪৪৩-৪৪, তাফসীরু আয়াতিন উশকিলাত 'আলা কাছীরিম মিনাল ওলামা ২/৫৭৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪৬)*। **দ্বিতীয়তঃ** যদি জেনেশুনে হারাম উপার্জন করে, আর তাতে বিপরীত পক্ষেরও স্বার্থ থাকে, তবে হারাম থেকে বিরত হওয়ার পর সে সম্পদ ফেরত দিতে হবে না। যেমন সূদ, ঘুষ ইত্যাদি। কিন্তু সে সম্পদ নিজে ভোগ না করে দান করে দিতে হবে। যদি সে সামর্থ্যবান না হয়, তবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রেখে বাকিটুকু ছাদাক্বা করে দিবে। **তৃতীয়তঃ** উপার্জনের মাধ্যম যদি মূলগতভাবেই হারাম হয়, যেমন- যেনা, মদ-জুয়া, হারাম বস্তু ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি, তবে তার লভ্যাংশ সর্বাবস্থায় ভোগ করা নিষিদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য। আর যদি এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে মানুষের হক বা হাক্কুল ইবাদ নষ্ট করা হয়, যেমন চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি তবে অবশ্যই খালেছ তওবার সাথে সাথে উক্ত সম্পদ মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর মালিককে না পাওয়া গেলে তার নামে ছাদাক্বা করে দিবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩১৩৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/১৪২; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৬৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৩২)*। এমতাবস্থায় সে দরিদ্র হ'লে একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিবে অথবা তার অবর্তমানে তার নামে কিংবা সাধারণভাবে ছাদাক্বা করে দিবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৬৯১)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি ছাগলের সাথে অপকর্ম লিপ্ত হয়। পরে গ্রাম্য সালিশে তাকে ৩০ হাযার টাকা জরিমানা করা হয়। আর উক্ত টাকা ছাগলের মালিককে প্রদান করা হয়। এক্ষণে মালিকের টাকা নেওয়াটা জায়েয হয়েছে কি? আর ছাগলটিকে কি করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : এরূপ জঘন্য ও ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির উপর বিচারক তার বিবেচনা অনুপাতে শাস্তি প্রদান করবেন। আর পশুটিকে হত্যা করতে হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১৪/২৪৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৯/৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়, সে অভিশপ্ত *(আহমাদ হা/১৮৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯১)*। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, তার উপর শাস্তি ওয়াজিব

হ'লেও 'হদ' নেই। কেননা উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটিতে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যে মানুষকে পশুর সাথে কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তাকে এবং পশুটিকে হত্যা কর। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হ'ল, পশুটির অপরাধ কি? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কিছু শুনিনি। তবে আমার ধারণামতে যে পশুটির সাথে এরূপ করা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) তার গোশত খাওয়া বা এটাকে কোন কাজে ব্যবহার করাকে লোকদের জন্য পসন্দ করেননি *(আবুদাউদ হা/৪৪৬৪; তিরমিযী হা/১৪৫৫; আহমাদ হা/২৪২০; ছহীহাহ হা/৩৪৬২)*। উক্ত হাদীছটিকে অধিকাংশ বিদ্বান যঈফ বলেছেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৪/৩৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে তুলনামূলক শক্তিশালী অপর এক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্ম করল, তার উপর কোন 'হদ' নেই *(তিরমিযী হা/১৪৫৫; মিশকাত হা/৩৫৮৬)*। অতএব শাস্তি হিসাবে উক্ত টাকা জরিমানা করা জায়েয হয়েছে। তবে ছাগলটিকে মেরে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : হাতির গোশত খাওয়া যাবে কী?

-শাহীন শেখ, মণিপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিদ্বানগণ হাতিকে হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্য করে হাতির গোশত হারাম সাব্যস্ত করেছেন। নববী (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট হাতির গোশত হারাম *(আল-মাজমূ' ৯/১৭)*। ইমাম আহমাদ ও ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, এটি হারাম। হাতির গোশত মুসলমানদের খাদ্য নয় *(মুগনী ৯/৪০৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৯/১৫)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : পিতা জীবদ্দশায় ছেলেদের বিবাহের পর পৃথক করে দেওয়ার সময় প্রত্যেককে ২-৪ বিঘা করে জমি দিয়েছেন। কিন্তু সেসময় মেয়েদের কিছু দেননি। এটা শরী'আতসম্মত হয়েছে কি? এক্ষণে তার করণীয় কি?

-আব্দুল হাই, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : সাময়িকভাবে পিতা তার কতিপয় সন্তানকে সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু জায়গা চাষাবাদ করার জন্য দিতে পারেন। তবে পিতার মৃত্যুর পর সেগুলো মীরাছ অনুপাতে ভাগ করে নিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আবুবকর (রাঃ) গাবা নামক স্থানের বাগানের কিছু খেজুর গাছ আমাকে দান করলেন। যার মধ্যে বিশ ওয়াসাক্ব খেজুর উৎপন্ন হ'ত। অতঃপর মৃত্যুর সময় বলতে লাগলেন, হে কন্যা! আল্লাহ্র কসম, আমার পরে তোমার হ'তে সচ্ছল কেউ থাকুক আমি তা পসন্দ করি না, আর তুমি দরিদ্র থাক তা আমার নিকট বেশী অপসন্দের। আমি তোমাকে এমন খেজুর গাছ দিয়েছিলাম, যার মধ্যে বিশ ওয়াসাক্ব খেজুর জন্মে। তুমি যদি তা দখলে রাখতে এবং ফল সংগ্রহ করতে থাকতে, তাহ'লে তা তোমার সম্পদ হয়ে যেত। এখন তো তা ওয়ারিছদের সম্পত্তি। ওয়ারিছ তোমার দুই ভাই ও দুই বোন। সুতরাং ওটাকে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে বণ্টন করে দিয়ো *(মুওয়াত্তা মালেক হা/২৭৮৩, ১৪৩৮; বায়হাক্বী হা/১১৭২৮; ইরওয়া হা/১৬১৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : মসজিদে ছালাতের স্থানের নীচ দিয়ে টয়লেটের পাইপ দেওয়ায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-লাল মুহাম্মাদ, মালদহ, ভারত।

উত্তর : মসজিদের নীচে সেফটি ট্যাঙ্ক বা টয়লেটের পাইপ দেওয়াতে কোন বাধা নেই। তবে অবশ্যই মসজিদের পবিত্রতা নিশ্চিত করতে হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরালো রাখতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৫৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/২৫০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২১৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : আমার বয়স ১২ হ'লেও বালেগ হওয়ায় মসজিদে পাঁচওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে চাই। কিন্তু পিতা-মাতা মসজিদে বিশেষত মাগরিবের ছালাতে যেতে দিতে চায় না। প্রহার করে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে ছালাতের জামা'আতে যেতে হবে। কেননা সন্তান বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তার জন্য জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। কেউ যদি আযান শোনার পরেও ওযর ছাড়া বাড়িতে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে গুনাহগার হবে *(নাসাঈ হা/৮৫০; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৯)*। এমনকি রাসূল (ছাঃ) বিনা ওযরে বাড়িতে ছালাত আদায়কারীদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনেছে, অথচ জামা'আতে হাযির হয়নি, তার ছালাত নেই; যদি তার কোন গ্রহণীয় ওযর না থাকে' *(দারাকুৎনী হা/১৫৫৫; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৬)*। এক্ষণে কেউ যদি বাড়িতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। তবে সে ওয়াজিব পরিত্যাগ করার জন্য গুনাহগার হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৭০)*। অতএব পিতা-মাতার উচিৎ বাধা না দিয়ে বরং সন্তানকে সাথে করে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করা। আর নিরাপত্তাজনিত বিশেষ কোন কারণ থাকলে সেটি স্বতন্ত্র এবং তা শারঈ ওযরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : সন্তান নাবালক থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যুর পর মা পিতার কোন সম্পদ বিক্রি করতে পারবে কি? যদি করে থাকেন তবে সন্তান সাবালক হওয়ার পর কি ঐ জমি দখল নিতে পারবে?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জয়পুরহাট

উত্তর : স্ত্রী তার মৃত স্বামী থেকে প্রাপ্ত মীরাছের সম্পদ বিক্রয় করতে পারবে। তবে সেটি বণ্টননামা চূড়ান্ত হওয়ার পর কার্যকর হবে। অতএব বণ্টননামা প্রস্তুতের পূর্বে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে থাকলে তা অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে। আর সরকারী আইনেও সেটি অবৈধ। অতএব এক্ষেত্রে সন্তান চাইলে সালিশের মাধ্যমে তার প্রাপ্য সম্পদের দখল বুঝে নিতে পারবে অথবা আদালতে মামলার মাধ্যমে তা ফেরত নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, পিতৃহারা সন্তানেরা ইয়াতীম। এদের সম্পদ মা অন্যায়ভাবে বিক্রয় করে থাকলে সেটি মহাপাপ হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা ইয়াতীমদের মাল-সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না উত্তম পন্থা ব্যতীত, যতদিন না ঐ ইয়াতীম তার উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয় *(আন'আম ৬/১৫২; শীরাযী, আল-মুহাযযাব ২/১২৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৯/৩০৫)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : আমাদের মসজিদের ইমাম আরবীতে খুৎবা

দেওয়ায় আমি কিছু বুঝতে পারি না। তাই এ সময় আমি নিজে নিজে তাসবীহ-তাহলীল করতে পারব কি? নাকি বুঝতে না পারলেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে?

-নাঈম ইসলাম, সান্তাহার, বগুড়া।

উত্তর : ইমামের খুৎবা চলাকালীন মুক্তাদী চুপ থেকে খুৎবা শুনবে যদিও সে ভাষা না বুঝে। কারণ খুৎবায় হাযির হওয়া জুম'আর দিনের বিশেষ ইবাদতের অংশ *(জুম'আ ৬২/০৯)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় যদি তুমি তোমার পাশের মুছল্লীকে 'চুপ কর' বল, তাহ'লে তুমি অনর্থক কথা বললে' *(বুখারী হা/৯৩৪; মিশকাত হা/১৩৮৫)*। একদা রাসূল (ছাঃ) খুৎবায় একটি আয়াত পাঠ করলে আবুদ্দারদা (রাঃ) উবাই বিন কা'বকে এর শানে নুযূল সম্পর্কে জানতে চান। একাধিকবার জিজ্ঞেস করার পরেও তিনি কোন জওয়াব দেননি। খুৎবা শেষে উবাই আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে বলেন, তুমি এত অনর্থক কথা বলছিলে কেন? ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, উবাই বিন কা'ব সত্য বলেছে। ইমামের খুৎবাকালীন সময়ে তুমি চুপ থাকবে *(আহমাদ হা/২১৭৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১১১১; ছহীহাহ হা/২২৫১)*। সুতরাং ভাষা না বুঝলেও জুম'আর দিন সময়মত মসজিদে উপস্থিত হবে এবং খুৎবা মনোযোগ দিয়ে শুনবে *(খারশী, মুখতাছার খলীল ১/২৮০২; যায়লাঈ, তাবীঈনুল হাক্বায়েক্ব ১/১৩২; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩৫)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : পিতা-মাতা সন্তানকে মন্দ কাজ করতে বাধ্য করলে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করলে তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে কি?

-শায়লা, টাঙ্গাইল।*

*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সুসম্পর্ক রাখাই ইসলামের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র পরই পিতা-মাতার হক আদায় করা যরূরী। এমনকি পিতা-মাতা কাফের হ'লেও তাদের সম্মান ও আনুগত্য করতে হবে; যদি না তারা শিরক, কুফরী বা অন্যায়ের আদেশ দেন *(আনকাবূত ২৯/৮)*। সুতরাং তারা দুনিয়াবী যত কষ্টই দেন না কেন তা ছোট করে দেখতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সাধ্যমত বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থায় তাদেরকে পরিত্যাগ করা যাবে না। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি তোমার পিতা-মাতাকে হেফাযত কর অথবা পরিত্যাগ কর' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪)*। জান্নাত পেতে গেলে সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে ও তাদের ভরণপোষণ করতে হবে *(ইসরা ১৭/৩০; লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতামাতার উভয়কে কিংবা কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না; তার নাক ধূলায় ধূসরিত হৌক! একথা তিনি তিনবার বলেন' *(মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) জনৈক কবীরা গুনাহগারকে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মায়ের সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : পিতা কি তার প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে পারেন? এছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক ভাই-বোন কপালে চুম্বন এবং কোলাকুলি করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : ভালোবাসা, দয়া বা স্নেহ প্রকাশার্থে মাহরাম নারী-পুরুষের জন্য আলিঙ্গন ও কপাল বা গালে চুম্বন করা জায়েয। সে হিসাবে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে কিংবা ভাই-বোন পরস্পরের কপালে বা গালে চুম্বন দিতে পারে এবং কোলাকুলিও করতে পারে। তবে কারো মনে অনৈতিক চিন্তার উদ্রেক ঘটার আশংকা থাকলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে *(ইবনুল মুফলেহ, আল-ইক্বনা ৩/১৫৬; আল-আদাবুশ শারইয়াহ ২/২৫৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৩/১৩০; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৭৮-৯)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : মসজিদে কর্মরত দারোয়ান মুছল্লীদেরকে সালাম দিয়ে থাকেন। এভাবে বৃহৎ জামা'আতের মসজিদে তিনি কতজনকে সালাম দিবেন?

-হাসীবুর রশীদ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : তিনি যতজনের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, সম্ভব হ'লে ততজনকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল উত্তম ইসলাম কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, অন্যকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া *(বুখারী হা/১২; মিশকাত হা/৪৬২৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখনও যেন সালাম দেয় *(আবুদাউদ হা/৫২০০; মিশকাত হা/৪৬৫০; ছহীহাহ হা/১৮৬)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় আলবানী (রহঃ) বলেন, একই ব্যক্তিকে একাধিকবার সালাম প্রদান করা সাব্যস্ত হয় যদি সামান্য পরেও পুনরায় সাক্ষাৎ হয় *(ছহীহাহ ১৮৫ হা/-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। ইবনু ওমর (রাঃ)-সহ ছাহাবীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা কেবল সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যেই বাজারে যেতেন।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : তিন ভাই, তিন যমজ বোনকে বিবাহ করেছে এবং মেয়ের বাড়িতেই বাসর সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সকালে উঠে দেখা যায় ভুলবশত কোন এক কারণে বউ বদল হয়েছে। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-হাসীবুর রশীদ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ভুলবশতঃ এমন ঘটনা ঘটে গেলে কেউ অপরাধী হবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/০৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমার উম্মতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ*

হা/২০৪৫; ইরওয়া হা/৮২, সনদ ছহীহ)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কেউ যদি স্ত্রী মনে করে কারো সাথে বা কারোর দাসীর সাথে সহবাস করে ফেলে তাহ'লে তাতে সে গুনাহগার হবে না *(ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ৩/৯০)*। এক্ষণে ভবিষ্যতে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে এমন ভুল আর না হয় এবং নিজ স্ত্রী নিয়ে এমন জায়গায় বসবাস করবে যাতে এমন সংমিশ্রণের সুযোগ না থাকে।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : বিবাহের পূর্বে পাত্রকে পাত্রীর ছবি দেওয়া জায়েয হবে কি?

-ইসমাঈল, পরাণপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রী দেখা মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮)*। তিনি আরো বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে সম্ভব হ'লে সে যেন পাত্রীকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে *(আবুদাউদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাত্রী দর্শনে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬)*। সুতরাং বিবাহের উদ্দেশ্যে ছবি দেখা জায়েয। তবে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন- ছবি শালীন হ'তে হবে, ছবি অন্য কোন গায়ের মাহরাম ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না এবং প্রস্তাবদাতা ছবি নিজের কাছে স্থায়ীভাবে রাখবে না।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : আমাদের এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরী করার সময় জিনদের তুষ্ট করার জন্য বাড়ির ভিতে সোনা-রূপা দেওয়া হয়। এলাকার ইমামরাও এটা করতে বলেন। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-যুলেখা ইয়াসমীন, হুগলী, ভারত।

উত্তর : জিন বা অন্য কোন প্রাণীকে খুশি করার জন্য ভবনের ভিতে সোনা-রূপা বা অন্য কিছু প্রদান করা শিরক। কারণ উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে *(বিন বায, মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ সংখ্যা ১৬০২, পৃ. ৩৪; ছালেহ ফাওযান, আস সিহরু ওয়াশ-শাউযা পৃ. ৮৬-৮৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ' *(যুখরুফ ৪৩/৮৪)*। তিনি অন্য আয়াতে বলেন, 'বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*। তাদের সাহায্য নেওয়া শিরক হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'আর কিছু মানুষ কিছু জিনের কাছে আশ্রয় চাইত। তাতে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা আরও বাড়িয়ে দিত' *(জিন ৭২/০৬)*। অতএব এমন শিরকী কর্ম থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : আমার কাছে কয়েকজন ব্যক্তির ৪০ হাযার টাকা বিশেষ কারণে জমা ছিল। নামের তালিকা হারিয়ে যাওয়ায় আমি কোনভাবেই তাদের শনাক্ত করতে পারছি না। তারাও জানে না যে তাদের টাকা আমার কাছে আছে। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা তাদের নামে কোন স্থানে দান করে দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে কি?

-জিএম ছফেদ আলী, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় প্রথমতঃ সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রাপককে খুঁজে বের করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের অবর্তমানে তাদের ওয়ারিছদের নিকট তা পৌঁছে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কোনভাবেই তাদের খুঁজে না পেলে তাদের নামে উক্ত সম্পদ ছাদাক্বা করে দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/১৯১)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি সাময়িকভাবে নিফাক্বী চলে আসে বা কিছুদিনের জন্য সে ছালাত পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? যদি পরবর্তীতে সে আবার ঈমানের হালতে ফিরে আসে, তাহ'লে তালাক হয়ে গেলে কি তাকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে?

-ছাকিব আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : সাধারণ আমলগত নিফাকীর কারণে ছালাত পরিত্যাগ করে থাকলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হবে না এবং স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদও হবে না। এমতাবস্থায় সে কবীরা গুনাহগার হবে। আর যদি আক্বীদাগত নিফাকী তথা কুফরীর পর্যায়ের যায় এবং ছালাতের বিধানকে অস্বীকার করে, তাহ'লে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীও তালাক হয়ে যাবে। তবে তওবা করলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/১০-১১; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/১৩৩-৪০' উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১০/২৮৮-২৯১)*। অবশ্য একদল বিদ্বান মনে করেন, ইদ্দতের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমেই সংসার করতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৪৯; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ২৭৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : মৃত সন্তানের বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের জন্য অছিয়ত করা কি তাদের দাদার জন্য ওয়াজিব? অছিয়ত করে না গেলে তার অন্য সন্তানেরা কি তাদের মৃত ভাইয়ের সন্তানদের জন্য কোন অছিয়ত নির্দিষ্ট করতে পারবে?

-লতীফুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃত সন্তানের ছেলে-মেয়েদের জন্য অছিয়ত করা দাদার জন্য ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব। আর তা সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পদ *(ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ১৪/২৯২)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কারু যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল' *(বাক্বারাহ ০২/১৮০)*। দাদা অছিয়ত না করে গেলে অন্য সন্তানেরা পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে যদি ইয়াতীম ভাতিজা-ভাতিজীর জন্য কিছু সম্পদ নির্ধারণ করে, তবে তা অতীব উত্তম কাজ হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'অছিয়ত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : আমার পিতার ১ ভাই এবং কয়েকজন বোন আছেন। পিতা ২০০৫ সালে এবং দাদা-দাদী ২০১২ ও ২০২১ সালে মারা গেছেন। দাদা মৃত্যুর পূর্বে মেয়েদের বঞ্চিত

করে সব সম্পদ আমার চাচাকে দিয়ে গেছেন। আমার মৃত পিতা ১৬ বিঘা নিজস্ব জমি রেখে গেছেন। যা থেকে আমার দাদা-দাদী অংশ পাবেন। এক্ষণে দাদা যেহেতু আমার ফুফুদের বঞ্চিত করেছেন তাই আমরা দাদা-দাদীর প্রাপ্য সম্পদ চাচাকে না দিয়ে ফুফুদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারব কি?

-আব্দুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : দাদা মেয়েদের বঞ্চিত করে কেবল ছেলেকে জমি লিখে দিয়ে কবীরা গুনাহ করেছেন। উক্ত ছেলের জন্য অত্যাবশ্যক হ'ল তার বোনদের প্রাপ্য হক ফিরিয়ে দেওয়া। অন্যথায় সেও কবীরা গুনাহগার হবে। মীরাছ বণ্টনের নির্দেশ দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৪)*। এক্ষণে সালিশ বা সমঝোতার মাধ্যমে চাচার সম্মতিতে উক্ত সম্পদ ফুফুদের দেওয়া যেতে পারে। তবে চাচা সম্মতি না দিলে তার প্রাপ্ত মীরাছের সম্পত্তি অন্যকে দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ চাচা ও ফুফুরা 'মেয়েরা ছেলের অর্ধেক' ভিত্তিতে অংশ পাবে *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : পিতার উপার্জিত সম্পদ হারাম হ'লে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান তা গ্রহণ করতে পারবে কি? এছাড়া পিতার মৃত্যুর পর জেনে শুনে ঐ সম্পদের ওয়ারিছ হওয়া বা তা গ্রহণ করা যাবে কি?

-তানভীর হোসাইন, খুলনা।

উত্তর : পিতার সম্পদ যদি মৌলিকভাবে হারাম না হয়, তাহ'লে তা থেকে মীরাছ গ্রহণে সন্তানদের কোন দোষ নেই। যেমন চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, সূদ, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ। যদি পিতার সম্পত্তিতে এই ধরনের সম্পদ থাকে এবং এর পরিমাণ জানা থাকে তাহ'লে সম্ভব হ'লে তা মালিককে ফেরত দিবে। অন্যথায় জনকল্যাণমূলক কাজে ছাদাক্বা করে দিবে এবং বাকী সম্পত্তি ওয়ারিছরা ভাগ করে নিবে। আর যদি পিতার সম্পদ হালাল-হারামে মিশ্রিত হয়, তাতেও সন্তানের জন্য মীরাছ গ্রহণে কোন দোষ নেই। কারণ হারাম উপার্জনের জন্য উপার্জনকারী পিতা গুনাহগার হবেন। সন্তান বা ওয়ারিছরা নয় *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৪৬-৫০, ২৬/৩৩২; উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন ৩/৩৭৭; আল-লিকাউশ শাহরী ১৬/৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : আমাদের অনেক বইয়ের ভিতরের অংশে অনেক ছবি থাকে যেগুলোর জীবন আছে। এসব ছবির কারণে ফেরেশতাগণ ঘরে প্রবেশ করতে পারবে কি?

-আকরামুযযামান, রাজশাহী।

উত্তর : যদি কোন ঘরে সম্মানের জন্য বা সৌন্দর্যের ছবি রাখা হয় বা টাঙানো থাকে, তাহ'লে উক্ত ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না *(বুখারী হা/৩২২৬; মুসলিম হা/২১০৬)*। তবে অপ্রদর্শিত কিংবা অবহেলিত স্থানে যেমন বইয়ের ভিতরে, বিছানার চাদরে, বালিশের কাভারে বা বসার চাটাইয়ে কোন প্রাণীর ছবি থাকার বিষয়টি ভিন্ন। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, যে সকল ছবি বিছানায়, বালিশে বা অনুরূপ স্থানে পদদলিত হয়, তা ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ নয় *(মা'আলিমুস সুনান ১/৬৫; তোহফা ৮/৭২)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি কোন ছবি বিছানায় বা বালিশে পদদলিত অবস্থায় থাকে তা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে নাজায়েয নয়। এমন স্থানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে *(লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৬/৮৬)*। উল্লেখ্য যে, যে সকল বাড়ি বা ঘরে ছবি ঝুলানো বা সাজানো থাকে তাতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। আর আযাব, হিসাব ও মৃতের ফেরেশতা সকল ঘরে প্রবেশ করে, ছবি থাক বা না থাক *(নববী, শরহ মুসলিম ১৪/৮৪; তোহফা ৮/৭২)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : ওযূ শেষে আসমানের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এসময় কোন দিকে ফিরে দো'আ পাঠ করতে হবে?

-নাছীফ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ওযূ শেষে দো'আ পাঠকালে আকাশের দিকে তাকাতে হবে মর্মে বর্ণিত অতিরিক্ত অংশটুকু 'মুনকার'। উক্ত মর্মে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হ'লেও আকাশের দিকে তাকানোর বিষয়টি নেই *(আহমাদ হা/১৭৪০১; ইরওয়া হা/৯৬, সনদ যঈফ)*। অতএব ওযূ শেষে যে কোন দিকে ফিরে দো'আ পাঠ করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : এশার পর বিতর ছালাত আদায় করে নিলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুর রাক্বীব, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : এশার ছালাতের সাথে বিতর পড়ে নিলেও তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারবে। তবে তাহাজ্জুদ শেষে দ্বিতীয়বার বিতর পড়া যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক রাতে দু'বার বিতর ছালাত নেই *(আবুদাউদ হা/১৪৩৯; ছহীহুল জামে হা/৭৫৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : গর্ভধারিণী নারী ছিয়াম পালনকারিনী ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কারিনীর সমান নেকী লাভ করে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-আকবার হোসাইন, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৫)*। এছাড়া মহিলারা যত সন্তান জন্ম দিবে ততটি কবুল হজ্জের নেকী পাবে মর্মে একটি বক্তব্য সমাজে প্রচলিত আছে, সেটিও বানোয়াট।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : যেসব ফকীর-মিসকীন ছালাত আদায় করে না তাদেরকে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-শাহীন, আবুধাবী, আরব আমিরাত।

উত্তর : নেকী পাওয়া যাবে। এমনকি চোর, ধনী বা কোন কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে ছাদাক্বা করলেও নেকী পাওয়া যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৭৬)*।

[সংশোধনী : গত ফেব্রুয়ারী'২২ সংখ্যায় (২৭/১৮৭) প্রশ্নোত্তরে ভুলক্রমে 'দ্বিতীয় মা মৃতের স্ত্রী হিসাবে এবং সন্তান না থাকায় এক-চতুর্থাংশ পাওয়ার পর বাকী সম্পত্তি চার ভাই সমানভাবে পেয়ে যাবে' বলা হয়েছে। বরং সঠিক উত্তর হ'ল, 'মৃতের ১ম স্ত্রীর সন্তান থাকায় ২য় মা স্ত্রী হিসাবে এক-অষ্টমাংশ পাবে এবং বাকী সম্পত্তি চার ভাই সমানভাবে পেয়ে যাবে'। অনাকাংখিত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। *-সম্পাদক।*]

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ সফল হোক

আবাসিক — আমাদের সেবা সমূহ — মিটিং রুম

রেষ্টুরেন্ট | কনফারেন্স হল | কমিউনিটি সেন্টার | ট্রেনিং সেন্টার

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এ আগত সকল মুছল্লীগণকে হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্বাবান্ধব আমন্ত্রিত।

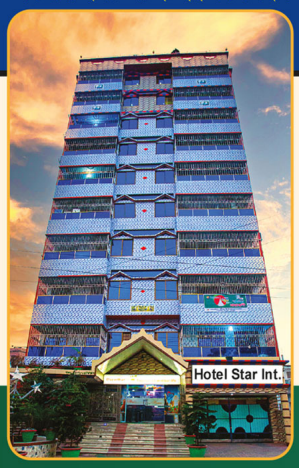

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি, আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

01784-400700 www.hotelstarint.com hotelstarint

সনি এন্টারপ্রাইজ

Sony Enterprise

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইম আলী (সনি)

মোবাইল : ০১৭১২-০১৫৩৭০

এখানে জমি ও পট সহজ ও সূদ বিহীন কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

এখানে রড, এঙ্গেল, বার, সীট এবং যাবতীয় স্টীল সামগ্রী ও সিমেন্ট পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

নওদাপাড়া, আমচত্বর থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক (তিলোত্তমা) এর পার্শ্বে
পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। ম্যানেজার : ০১৯২৬-৩৫৭৩৩৫, ০১৯১০-৭২৪৬৬৬।

সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত কিছু বই

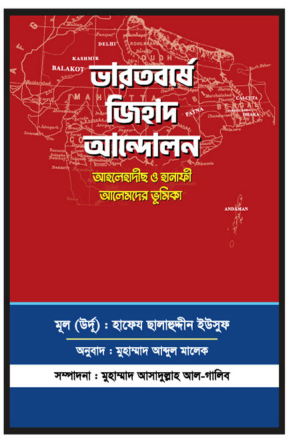

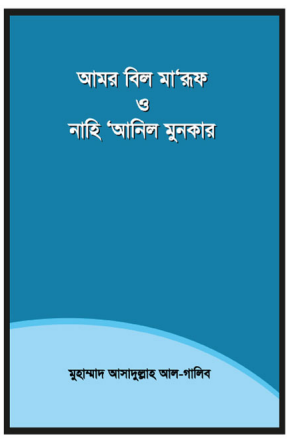

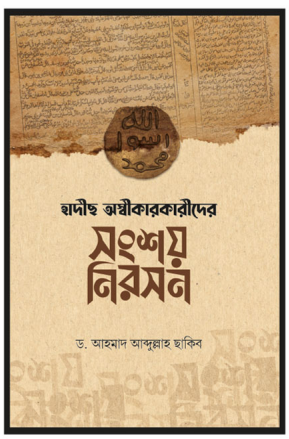

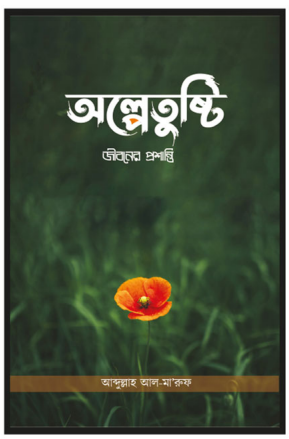

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 6, March 2022

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা' ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ৩১ বছর যাবৎ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর দলীল ভিত্তিক ও আখেরাতমুখী আলোচনা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ এখানে জমায়েত হন। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে এর মাধ্যমে হাযার হাযার মানুষ বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসছেন। প্রতিবছর উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কয়েক বছর যাবৎ জায়গার সংকটের কারণে উপস্থিত ভাই-বোনদের দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়। একই কারণে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বর্তমানে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ২০২১ সালের তাবলীগী ইজতেমায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আগামীতে নিজস্ব ময়দানে তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ একর জমি ক্রয়ের ঘোষণা দেন এবং উক্ত স্থানে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের স্থান নির্ধারিত হয়েছে এবং এক একর জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এক বিঘা বা এক কাঠা জমির মূল্য অথবা কমপক্ষে একজন বসার স্থানের সমপরিমাণ মূল্য ২৫০০ টাকা এবং সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যেককে ৫ থেকে ১০ হাযার টাকা দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। যিনি যত বেশী দান করবেন তার নেকীর পাল্লা তত বেশী ভারী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে উক্ত ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, **একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭**
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং ০১৭৯৭-৯০০১২৩; রকেট নং ০১৭৯৭-৯০০১২৩০

সেক্রেটারী জেনারেল
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।